ছোট পাখী
নীল আকাশ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

মিত্র প্রকাশনী
২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রদীপ্ত কুমার মিত্র
মিত্র প্রকাশনী
২০৬ বিধান সরণী,
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
শ্রীশচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅর্জ্জুন কুমার ভৌমিক
নিউ সত্যনারায়ণ প্রেস
২৬ গোয়াবাগান লেন,
কলিকাতা—৬

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা মাত্র

সুধাকে

দাদা

এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

বারো ঘর এক উঠোন
রাবন বধ
প্রেমের চেয়ে বড়
এই তার পুরস্কার
তিন পরী ছয় প্রেমিক ইত্যাদি

নিমকি মাছ কুটছিল। ভোলা আলুর খোসা ছাড়ায়। তার মাথা-মোটা বেঁটে আঙুলগুলি কেমন তড়বড় করে নড়ছে, মাছ কোটার ফাঁকে ফাঁকে কালো মিশমিশে চোখ দুটো তুলে নিমকি তাকিয়ে দেখে, তারপর ফিকফিক হাসে।

ভোলা শব্দ করে না।

'আচ্ছা তোর এগারোটা আঙুল কেন বলতে পারিস ভোলা?'

তবু ভোলা চুপ। কড়াই থেকে সেদ্ধ করা আলু তুলে বেঁটে আঙ্গুলের কালচে নখ দিয়ে খামচে খামচে খোসা ছাড়ায়।

'তোর এগারোটা আঙ্গুল আর আড়াইটে কান!' মাছের আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে নিমকি কুলকুল করে হাসে।

ওদিক থেকে বামুনঠাকুর তাড়া দিচ্ছে। 'জল্‌দি কর, চটপট সেরে দে—বাবুরা চানে চলল। ঝোল নামাতে পারব না।'

'নামাতে পারব না তো আমাদের কী রে বাম্‌না, আমাদের কি চারটে করে হাত দিয়েছে ভগবান?' রান্না ঘরের দিকে চোখ রেখে নিমকি ভেংচি কাটে। আর বামুন ঠাকুরের মুণ্ডপাত করে। তারপর ভোলার দিকে তাকায়।

'এই ভোলা!'

'বড় জ্বালাচ্ছিস নিমকি।' ভোলা এবার চোখ লাল করল। 'বকবক বকবক—ফের যদি কথা কয়েছিস তোর মাথার একটা চুল আমি রাখব না।'

'আহা, চটিস কেন!' আসলে ভোলাকে চটাবার জন্যই নিমকি ক্রমাগত বকে চলেছে। ভোলা চটে গিয়ে যখন চোখ দুটো পাটনাই

পেঁয়াজের মতন লাল করে বড় করে তার দিকে তাকায়, নিমকি ভীষণ আমোদ পায়। ভোলার ডান হাতে পাঁচটার জায়গায় ছটা আঙুল। বুড়ো আঙুলের পেটের কাছে একটুকুন, আদার গা ফুঁড়ে যেমন শিকড় বেরোয়, অতিরিক্ত একটা আঙুল তেমনি মাথা তুলে আছে। একরত্তি আঙুলটার মাথায় নখও রয়েছে। তবে দু হাতের আর দশটা আঙ্গুলের মতন এটা নড়ে না। এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

আর নিমকি যেমন বলে, তার আড়াইটে কান, এটা বাজে কথা। আসলে ভোলার বাঁ কানের পিছনে নয়া পয়সার সাইজের একটা আঁচিল গজিয়েছে।

ভোলা বলে, জন্ম থেকে তার কানের এই আঁচিল, জন্ম থেকে তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে এই ক্ষুদে আঙ্গুল।

নিমকি বিশ্বাস করে না।

'উঁহু, জন্ম থেকে কেন হবে। তোর মা ঠিকই বিইয়েছিল তোকে, আমাদের মতন তখন তোর দু'হাতে দশটা আঙুল ছিল, মাথার দু'পাশে দুটো কান ছিল, পরে ওই বাড়তি জিনিস দুটো গজিয়েছে।'

'তুই আমার জন্ম দেখেছিলি, না?' ভোলা দাঁত খিঁচোয়, 'ফের যদি কোনোদিন জন্ম জন্ম করবি, লাথি মেরে তোর নাক ভোঁতা করে দেব।'

'আহা রে, চাকর আবার লাথি মারতে জানে! হোটেলের চাকর হোটেলের বাবুদের জুতোটুতো বারান্দায় পড়ে থাকলে ঘরে তুলে রাখে, জামাকাপড়ে সাবান মাখে, বাবুদের গা টিপে দেয়, দরকার হলে পা টেপে।'

'তুই দেখেছিলি কোনোদিন কোনো শালা বাবুর জুতো বারান্দায় পড়ে থাকলে ঘরে তুলে রেখেছি? কোনো শালা বাবুর পা টিপেছি?'

কথাটা শুনে ভোলা এত রেগে যায়, রীতিমত কাঁপতে থাকে। পেঁয়াজের মতন লাল চোখ দুটো চকচক করতে থাকে, যেন কোথাও

থেঁতলে গিয়ে পেঁয়াজ থেকে রস গড়াচ্ছে, অর্থাৎ অতিরিক্ত চটে গেলে চোখে তার জল এসে যায়, আর তখন তার মুখ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না, তোতলাতে আরম্ভ করে। 'আমি চাকর, আর তুই কী—তুই চাকরানী না ? না কি তুই হোটেলের বিবি।'

'এই নিমকি, মাছটা কুটে দিবি ?' বামুন ঠাকুর গরম হয়ে রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে। 'এই উল্লুক,' লোহার হাতাটা নিয়ে ছুটে এসেছে ঠাকুর। যেন এবার হাতাটা ভোলার মাথায় বসিয়ে দেবে, ঠিক তেমন করেই সেটা ভোলার মাথায় উঁচিয়ে ধরেছে। 'ক মণ আলু তোকে ছুলতে দেওয়া হয়েছে শুনি, সেই কখন সেদ্ধ করে নামিয়ে দিয়েছি—'

ভোলা কথা বলে না, মাথা গুঁজে আলুর খোসা ছাড়াতে মন দেয়, নিমকি মুখ বুজে মাছ কুটতে থাকে।

'কী জ্বালায় পড়া গেছে দুটোকে নিয়ে। রাতদিন কেবল ঝগড়া, একটার মাথা আর একটায় খায়—অ্যাঁ! ঝগড়া করার যদি ইচ্ছে হয় তবে রাস্তায় বেরিয়ে যা না, পরের চাকরি করা কেন—'

নীচে হৈ চৈ হল্লা শুনে ম্যানেজার ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে।

'কী হল ঠাকুর!' দোতালায় নিজের অফিস ঘরে বসে ম্যানেজার বাজারের হিসাব দেখছিল। হিসাবের খাতাটা হাতে নিয়ে রেলিং-এর ওপর দিয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিল। 'এত চেঁচামেচি হচ্ছে কেন ?'

'চেঁচামেচি হবে না ? সাড়ে আটটা বেজে গেছে, বাবুরা চানে চলল, আমি রান্না নামিয়ে দেব কখন, এই দুটোতে এখানে বসে ঝগড়া করছে, মাছের মনে মাছ পড়ে আছে, আলুর মনে আলু পড়ে আছে—' নীচে থেকে ঠাকুর চিৎকার করে উঠল।

'এই নিমকি, হাত চালা, হাত চালা। এই ভোলা, উল্লুক, কাজ করার ইচ্ছে না থাকে কেটে পড় না।'

'উহু, কেটে পড়বে না, তবে আর এখানে থালা থালা ভাত গিলবে কে?' ঠাকুর আবার হাতাটা ভোলার মাথার ওপর উঁচিয়ে ধরল।

'দে, চট করে আলুটা ছাড়িয়ে দে।' ম্যানেজার কাজের তাড়া দিল। আর রেলিং ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকল না, ঘরে ঢুকে পড়ল।

নিজের মনে বকবক করতে করতে ঠাকুরও রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

এটা হোটেলের পিছন দিক, এখানে রান্নাঘর, রান্নাঘরের পাশেই আনাজের খোসা, ডিমের খোসা, মাছের আঁশ, শাকপাতা ইত্যাদি জঞ্জাল নিয়ে ময়লা ফেলার জায়গা। ঠিক তার পাশেই হোটেলের ঠাকুর চাকরের ব্যবহারের কল-পায়খানা। সঙ্গে ছোট একটা চৌবাচ্চা। চাল ডাল মাছ আনাজ এই চৌবাচ্চার জলে ধোয়া হয়। বাবুদের কল-পায়খানা হোটেলের সামনের দিকে। ওখানটা অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু এখন বেলা সাড়ে আটটা নয়টা, সেখানে দারুন ভীড়, গোলমাল। বাবুরা হৈ-হৈ করে গায়ে সাবান মাখছে, জল ঢালছে, গুনগুনিয়ে গান করছে কেউ, গান করতে করতে মাথায় জল ঢালছে। কেউ একজন কংগ্রেস সরকারের কাজের কড়া সমালোচনা করছে, একজন প্রায় সশরীরে ভিয়েৎনামের যুদ্ধে চলে গেছে, কেউ চাঁদের জমি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, বাকী কজন ভাগাভাগি হয়ে ফুটবল খেলা অথবা সিনেমা নিয়ে কথা বলছে।

ওদিকের ঝপঝপ জল ঢালার শব্দ, বালতির শব্দ, চাঁদ ভিয়েৎনাম নিয়ে হৈ-চৈ রান্নাঘরের পাশের এই নিরিবিলি জায়গাটায় ভেসে আসছে।

কিন্তু ভেসে এলেও নিমকি বা ভোলার সেদিকে কান নেই। তারা অন্য জগতের মানুষ।

তারা পাশের জঞ্জালের ওপর মাছির ভনভন এবং পাঁচিলের ওপর সার বেঁধে বসে থাকা কাকের চিৎকার শুনছে। আর শুনছে রান্নাঘরের

হাতা খুন্তি নাড়ার শব্দ। মসলার ঝাঁজে ফোড়নের গন্ধে ঠাকুরের বড় বড় হাঁচি কাশির শব্দ।

একসঙ্গে ঠাকুর ও ম্যানেজারের বকুনি খেয়ে দুজনে সেই যে চুপ করে আছে, আর কথা বলছে না, ঝগড়া করছে না। মাছ কোটা শেষ করে ঝুড়িশুদ্ধ চৌবাচ্চার কাছে তুলে নিয়ে নিমকি ধুতে লেগে গেল।

ভোলাও হাতের কাজ শেষ করেছে। আলুর ঝুড়িটা রান্নাঘরে ঠেলে দিল।

তারপর দুজনকেই ছুটতে হয় খাবার ঘরে বাবুদের ঠাঁই করে দিতে। রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরের পাশে লম্বালম্বি একটা হলঘরের মতন, ভিতরটা অন্ধকার স্যাঁৎস্যাঁতে। আগে মেঝেয় চাটাই বিছিয়ে বাবুরা খেতে বসত। এখন টেবিল চেয়ার হয়েছে। এবং মাথার ওপর একটা পাখাও খাটানো হয়েছে। পাখাটার দারুন ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয়। কিন্তু বাবুরা যখন খেতে বসেন তখন শব্দটা যেন কোথায় তলিয়ে যায়।

কেননা কলতলার ও চৌবাচ্চার ধারের হৈ-হৈ হল্লাগুলি তখন খাবার ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে। কংগ্রেস সরকার ভিয়েৎনাম মোহনবাগান চাঁদ সায়রাবানু নিয়ে খাবার টেবিল সরগরম। নিমকি এতবড় একটা কলাই করা লোহার জাগ্ হাতে ছুটে ছুটে বাবুদের গেলাসে জল ঢেলে দেয়। বাবুদের খাবার সময় ভোলা কিন্তু আর উপস্থিত থাকে না, থালা গেলাস টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে তাকে কেটে পড়তে হয়। বাবুদের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে আবার তার কাজ। এঁটো বাসন একত্র করে ভিতরের কলতলায় গিয়ে মেজে ধুয়ে সাফ করা। আর নিমকি জলন্যাতা বুলিয়ে খাবার টেবিল পরিষ্কার করে। চেয়ারগুলি টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে দেয়।

এঁটো বাসন কিন্তু নিমকিরও ধোয়ার কথা। কিন্তু এই কাজে

তার ভীষণ গড়িমসি। টেবিল পরিষ্কার করছে তো করছেই, ঘড়ঘড় শব্দ করে চেয়ারগুলি সরাচ্ছে।

ওদিক থেকে ভোলা তাকে বার বার ডাকে। ডাঁই হয়ে এঁটো থালা গেলাস বাটি পড়ে আছে। পাঁচিলের মাথার কাকগুলো ততক্ষণে এঁটো খেতে নীচে নেমে এসেছে। ভোলা একদিকে কাক তাড়াতে ব্যস্ত, আর একদিকে বাসন মাজে, আর মাঝে মাঝে ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখে নিমকি এল কি না।

ভোলা বুঝতে পারে ছুতো করে ছুঁড়ি কলতলার দিকে আসছে না, এঁটো ধুতে তার বেজায় ঘেন্না। কেননা কোনোদিন যদি ম্যানেজারের ধমক খেয়ে এঁটো বাসনে ওকে হাত লাগাতে হয় সেদিন নিমকি নাকের ডগাটা কুঁচকে রেখে এমন একটা চেহারা করে, যেন কেউ জোর করে তাকে পায়খানায় বসিয়ে দিয়েছে। বার বার কেমন থুথু ফেলে, আর ঐ ঘেন্নার চেহারা নিয়ে করুণ চোখে ভোলার মুখটা দেখে, অর্থাৎ ভোলা যদি একলাই সব থালা গেলাস ধুয়ে শেষ করে।

কিন্তু আজ ভোলা গোঁ ধরেছে। আজ কিছুতেই সে একা সব বাসন ধোবে না। দু'ভাগ করে কিছু থালা গেলাস কাছে টেনে নিয়েছে, আর একভাগ নিমকির জন্য ফেলে রেখেছে। কাকের দল নিমকির বাসনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এঁটো খুঁটে খাচ্ছে। একটা গেলাস গড়াতে গড়াতে নর্দমার কাছে চলে গেল। ভোলা যেন দেখেও দেখল না। নিমকির বাসন। ও এসে ধোয় ধোবে, না হয় পড়ে থাকবে।

॥ দুই ॥

তখন রোদ পড়ে গেছে। ওপরটা একেবারে ঠাণ্ডা। একটা শব্দ নেই। বাবুরা সব কাজে বেরিয়ে গেছে। নিমকি যে কোন্ ফাঁকে দোতলায় গিয়েছিল ঈশ্বর জানে। যখন নীচে নেমে এল তখন তার মুখটা হাসি হাসি।

নিচে কলতলায় এসে সে কোমরটা একটু বাঁকা করে চৌবাচ্চার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। ভোলা মুখ তুলল না। তার ভাগের থালা গেলাস ধোয়া প্রায় শেষ। সব তুলে নিয়ে এবার ভাঁড়ার ঘরে সেগুলি রাখতে যাবে।

'এই ভোলা।' নিমকি ডাকল।

ভোলা চুপ। ধোয়া বাসনগুলি একপাশে রেখে নিজের হাত ধুচ্ছে, পা ধুচ্ছে।

'আঃ, কী অংকার রে তোর ভোলা !'

মুখ হাত ধুয়ে কোমরের গামছাটা খুলে নিয়ে ভোলা মুখ মোছে, যেন নিমকির কথা সে শুনতে পায়নি এমন একটা ব্যস্ততার ভাব নিয়ে মুখ মোছা শেষ করে সে হাত মোছে পা মোছে।

'এইশোন।' তেমনি হাসিহাসি মুখ করে নিমকি এক পা সরে এল।

এবার ভোলা গরম হয়ে উঠল। চোখ লাল করল।

'ফের আমার সঙ্গে কথা কইছিস !'

'কেন, তোর সঙ্গে কথা বললে দোষ কী।'

'তুই আমার সাথে কথা বলবিনি, আমি বারণ করে দিচ্ছি।' ধোয়া বাসনের পাঁজা তুলে ভোলা দুপদাপ করে ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলে গেল।

চোখ ট্যারা করে নিমকি দেখল তার ভাগের বাকী অর্ধেক বাসন টাল হয়ে পড়ে আছে। কাক শালিকে ঠোকরাচ্ছে, ঝন্ ঝন্ শব্দ করে গেলাসটা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, বাটিটা উল্টে যাচ্ছে।

বাসন রেখে ভাঁড়ার ঘর থেকে ভোলা বেরিয়ে আসতে নিমকি আবার ডাকল, 'এই শোন, কথা আছে।'

ভোলা খাবার ঘরের ভিতর দিয়ে ওদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে, নিমকি তার পিছনে ছুটল।

কিন্তু ভোলা খুব একটা ছুটছিল না, নিমকি গিয়ে তার ডান হাতটা ধরে ফেলল। ভোলা ঘুরে দাঁড়াল। কটমট করে তাকাল।

'মনে হচ্ছে আমায় চিবিয়ে খেয়ে ফেলবি।' নিমকি ফিক্ করে হাসল।

'ভাল চাস্ তো আমার হাত ছেড়ে দে।'

'যদি না ছাড়ি তো করবি কী?'

নিমকি দেখছিল ভোলার হাতটা বাটনা বেটে বেটে কেমন খরখরে হয়ে গেছে।

আঙুলের সব কটা নখে হলুদের ছোপ। যেন এই জন্মে তার নখের রং আর সাদা হবে না।

'ছেড়ে দে নিমকি, আমায় চটাস্ নে।'

'তোর হাতের খুদে আঙুলটা দেখছি, ওটা দেখতে আমার এত ভাল লাগে। কী সুন্দর নখ হয়েছে ওটার।' নিমকি ঝুঁকে ভোলার বুড়ো আঙুলের গায়ে লাগানো ছোট আঙুলটা দেখছিল।

ভোলা বুঝল ছুঁড়ি এখনই আবার তার এগারোটা আঙুল আর আড়াইটা কান নিয়ে হাসি-মস্করা করবে।

'ছাখ, আমি ঠাণ্ডা মানুষ, সহজে চটি না, কিন্তু যেদিন চটব, তোকে এমন মার লাগাব—বাবার নাম ভুলিয়ে দেব। আমার হাত ছেড়ে দে, এখনো বলছি হাতটা ছেড়ে দে।'

'কেন, আমি কি তোর হাত ধরতে পারি না?' আব্দারের সুর করল নিমকি।

'না, আমার গায়ে হাত দিবি না—অনেক দিন বারণ করেছি।' ভোলা জোরে মাথা ঝাঁকালো।

'কেন, তুই কি খুব বড়লোক হয়ে গেছিস।' এক সেকেণ্ড থেমে থেকে যেন কিছু একটা ভেবে নিয়ে নিমকি আবার ফিক্ করে হাসল। 'তুই কি সন্তোষবাবু না প্রিয়বাবু?'

ভোলা হঠাৎ গুম মেরে গেল। এই হোটেলে যত বাবু আছে তাদের মধ্যে সন্তোষবাবু ও প্রিয়বাবুই পয়সাওলা মানুষ। সন্তোষবাবু নাকি হাজার টাকার ওপর মাইনে পায়। ওপরে দশ নম্বর ঘরে একলা আছে। ট্যাক্সি চড়ে রোজ অফিসে যায়, ট্যাক্সি করে ফেরে। তাঁর জামা জুতো জিনিসপত্র দেখলে বোঝা যায় মোটা মাইনের চাকুরি। এই যে একটু আগে নীচে হলঘরে বাবুরা খেয়ে গেল তাদের মধ্যে কিন্তু সন্তোষবাবু ছিল না। সন্তোষবাবুকে তাঁর ঘরে টেবিলে ভাত পোঁছে দিয়ে আসতে হয়। তেমনি একলা আট নম্বর ঘরটা নিয়ে আছে প্রিয়বাবু।

প্রিয়বাবু অফিসে চাকরি করে না। কিন্তু কী যে ভদ্রলোক করে সঠিক করে কেউ বলতে পারে না। একজন বলে, রাধাবাজারে প্রিয়বাবুর রঙের দোকান আছে, রঙের ব্যবসা করে। আর একজন বলে, প্রিয়বাবু একটা বিলাতী ওষুধের কোম্পানির সেল্‌সম্যান। ঘুরে ঘুরে কল্‌কাতার বড় বড় ওষুধের দোকানের অর্ডার নিয়ে আসে। আর একজন বলে, ভদ্রলোক সিনেমার লাইনে আছে, ধর্মতলায় কোথায় একটা অফিসে নাকি তাঁকে দেখা যায়, সিনেমার ছবি কেনাবেচা যাদের কাজ। প্রিয়বাবুও হোটেলের আর সব বোর্ডারের সঙ্গে হলঘরে একত্র বসে খায় না। তাঁকেও তাঁর ঘরে ভাত পোঁছে দিয়ে আসতে হয়। সব

সময় কেতাদুরস্ত সাহেবী পোশাক পরে মেস থেকে বেরোয়। এবং সন্তোষবাবুর মতন কথায় কথায় ট্যাক্সির দরকার হয়। আবার কোনো কোনো সময় একটা জমকালো প্রাইভেট গাড়ি তাঁকে নিয়ে যেতে আসে বা রাত্রের দিকে ওই গাড়িটা তাকে হোটেলে পৌঁছে দেয়। কেউ বলে, সিনেমা কোম্পানির গাড়ি। কোন্‌টা সত্য তা এক প্রিয়বাবুই বলতে পারে।

কিন্তু এখন নিমকির মুখে এই দুটো নাম একসঙ্গে শুনে ভোলা বেজায় গম্ভীর হয়ে গেল। নিমকি তার হাতটা ছেড়ে দিল।

'আমি চাকর, হোটেলের বাসন মাজি বাটনা বাটি, আমি কি বলছি যে আমি একটা মস্ত বড়মানুষ।' ভোলা গজগজ করে উঠল।

'আমিও তো চাকরানী।' একটা ঢোক গিলে আদুরে গলায় নিমকি বলল, 'এই জন্যেই তো তোর হাত ধরি। আমি বাসন মাজি, জল তুলি।'

'তুই চাকরানী হবি কেন, তুই এই হোটেলের বিবি।' ভোলার গলায় অভিমান থমথম করছিল।

'ইস্‌, এত রাগ করছিস আমার ওপর!' যেন আবার ভোলার হাতটা ধরতে গেল নিমকি।

ভোলা হাতটা সরিয়ে নিল।

'হুঁ, তুই বিবি, তুই বিবি, তোর অনেক আদর এখানে।' ভোলা এদিকে তাকাচ্ছিল না, দেয়ালের দিকে চোখ রেখে থমথমে গলায় বলল, 'তুই খোঁচাখুঁচি করে তখন ঝগড়া বাঁধালি আর ওই শালা বামনা কিনা ছুটে এসে আমায় উল্লুক বলল, মানিজার বাবু আমায় উল্লুক বলল, উল্লুক বামনা আমায় হাতার বাড়ি মারতে চায়।'

এবার তার রাগের কারণটা বুঝল নিমকি। ঘাড় গুঁজে একটু সময় হাতের নখ খুঁটল। মাথার তুলনায় তার ঘাড়টা একটু বেশী

লম্বা। এই জন্য দেখতে অনেক সময় ভাল লাগে, আবার কারো চোখে খারাপও লাগে। সরু রোগা হাত পা। মাথায় চুল কম। খোঁপাটা একটুখানি। ভোলা অবশ্য অনেকদিন তাকে শাসিয়েছে, মেরে শেষ করবে। চব্বিশ ঘণ্টা তার কান নিয়ে আঙুল নিয়ে ঠাট্টা তামাসা সে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু যখন একটু মনোযোগ দিয়ে নিমকিকে দেখে, তখন কিন্তু ভোলার মনে হয়, মেরে ঠাণ্ডা করবে, ওইটুকুন হাল্‌কা একটা শরীরে মার লাগাবে কোথায়, যেন আঙুলের টোকা সহ্য হবে না, নিমকি মাটিতে ছিটকে পড়বে।

'না, আর তোকে তোর আঙুল নিয়ে কান নিয়ে ঠাট্টা করব না।' যেন নিমকির এখন একটু অনুতাপ হল। ঠাকুর ও ম্যানেজার যে তখন ভোলাকেই বেশি গালিগালাজ করে গেল, নিমকির এখন মনে পড়ল।

কিন্তু নিমকির এই নরম কথায় ভোলার মন উঠল না। দেয়ালের দিকে তার মুখটা ঘোরানো ছিল। এবার ঘাড় গুঁজে আস্তে আস্তে ওদিকের দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে গেল। একটা কথাও আর বলল না। নিমকি ফ্যালফ্যাল করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর কলতলায় ফিরে এসে তার ভাগের এঁটো বাসন ধুতে বসল। তার নাকের ডগা কুঁচকে রইল। যেন এর চেয়ে ঘেন্নার কাজ সংসারে আর নেই।

এ সময় বাড়িটা বেশ একটু চুপচাপ থাকে। বাবুরা বেরিয়ে যাবার পর রান্নাঘরের দরজার শিকল তুলে দিয়ে বামুন ঠাকুর কোথায় যেন হাওয়া খেতে বেরোয়।

ভোলা বলে, রাস্তার ওপর কানাই ময়রার দোকানে বামুনটা রোজ গাঁজায় দম দিতে যায়। বেলা দশটায় একবার দম দেবে। তারপর হোটেলে ফিরে এসে চান করতে যাবে, তিনটা বাজলে কানাই ময়রার দোকানে ছুটে যাবে। আর যাবে রাত নটার পর। তিনবার গাঁজায় দম না দিলে হীরু ঠাকুরের পেট ফুলে ওঠে।

ম্যানেজারও এসময় দোতলার অফিস ঘরে তালা ঝুলিয়ে কোথায় যেন বেরোয়। ভোলা বলে, ম্যানেজার নাকি এ সময় মোড়ের শশধর কোবরেজের বৈঠকখানায় বসে ফুড়ুক ফুড়ুক করে হুঁকো টানে, রেসের মাঠের বই উল্টে উল্টে ঘোড়ার টিপ ঠিক করে, আর ঘন ঘন রাস্তার দিকে তাকায়। হরসুন্দরী বিদ্যালয়ের মেয়েগুলি তখন বই খাতা বগলে নিয়ে বেণী দুলিয়ে রাস্তা আলো করে চলে। ঠিক এই নিরিবিলি সময়টায় নিমকি আর ভোলা কলতলায় বসে বাসন মাজে, গল্প করে, আর মাথার ওপর পাঁচিলের গায়ে কাকগুলি কা-কা করে।

কিন্তু আজ ভোলা রাগ করে তাড়াতাড়ি তার বাসনগুলি ধুয়ে কেটে পড়ল। কোথায় গিয়ে ভোলা এখন ঘুরে বেড়াবে কে জানে।

নিমকির খুব খারাপ লাগছিল।

খারাপ লাগছিল, আবার তার বুকের মধ্যে রঙ্গিন মাছের মতন একটা সুখের ভাবনা পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছিল।

এই কথাটাই ভোলাকে বলবে বলে সে ভোলার পিছনে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু ভোলা শুনল না। রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

ঘেন্নার কাজটা কোনোরকমে সেরে ফেলে নিমকি হাত-পা ধুয়ে ভাঁড়ার ঘরে থালা গেলাস তুলে রেখে দরজার শিকল টেনে দিল।

এখন সে কী করবে ভেবে পেল না। আজ সন্তোষবাবুর কাছে পুরো একটা টাকা সে বকসিস পেয়েছে। এই কথাটাই ভোলাকে বলতে চেয়েছিল নিমকি। ভেবেছিল ভোলার হাতে আট আনা গুঁজে দেবে। কেননা ভোলাও তো চাকর, রাতদিন মুখ বুজে বাবুদের কাজ করে। আর ভোলার কপালে একটা পয়সা বকসিস জোটে না। বকসিস পেতে-পেতে সেই পুজো। সারা বছর একটা পয়সা কেউ তাকে দেয় না। আর রাজ্যের ছুটোছুটির কাজ কিনা ভোলাকে দিয়ে। ভোলা সিগারেট নিয়ে আয়। ভোলা চট করে পান নিয়ে আয়। ভোলা আমার ব্লেড এনে দে, সাবান এনে দে, খাবার এনে দে মোড়ের

তার হাতে গুঁজে দিচ্ছে। হোটেলের জল তোলা, বাসন ধোয়া, মাছ কোটা, আনাজ কোটা ছাড়াও বাবুদের দুটো একটা ফাইফরমাশ তাকে খাটতে হয়। যেমন কোনো বাবুর লেপটা বালিশটা রোদে দেওয়া, বিছানাটা ঝেড়ে দেওয়া। এসব কাজে একশবার তাকে ওপর-নিচ করতে হয় না, রাস্তায় দোকানে ছুটতে হয় না। অনেক হালকা কাজ।

বাবুরা অফিসে চলে যাবার পর এদিকে আর কাজ থাকে না। তখন ধীরে সুস্থে নিমকি ওপরের কাজগুলো সেরে ফেলে। বাবুরা ঘরের চাবিটা তার কাছে রেখে যায়। অন্তত সেদিনের মতন রেখে যায়।

তা না হলে নিমকি লেপ বালিশ রোদে মেলে দেবে কেমন করে, বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করবে কেমন করে। ময়লা গেঞ্জি রুমালে সাবান মাখাতে হলে ঘর থেকে তো সেগুলো বের করে আনতে হবে।

পালা করে এক একদিন এক এক ঘরের কাজ করে নিমকি। সন্তোষবাবু ও প্রিয়বাবু ছাড়া এক একটা ঘরে দুজন করে বাবু থাকে। কাজেই যদি তিন নম্বর ঘরের কান্তিবাবু নিমকিকে তার তোষকটা বালিশটা রৌদ্রে দিতে বলে যায় তো কান্তিবাবুর রুমমেট জগদীশবাবুরও তখন মনে পড়ে তাঁর বিছানাটাও রৌদ্রে দিয়ে ঝেড়েটেরে পরিষ্কার করা দরকার। তাতে নিমকিরও সুবিধা হয়, একদিনে একটা ঘরের কাজ সারা হয়ে যায়। সেই দুপুরের মতন ওই ঘরের চাবি নিমকির জিম্মায় চলে আসে। এভাবে একদিন পাঁচ নম্বর ঘর, একদিন ছ নম্বর ঘরের বাবুদের গেঞ্জি রুমাল কাচা কি বিছানা রৌদ্রে দেওয়ার পালা আসে এবং বাবুরা সেদিন নিমকির কাছে চাবি রেখে যায়।

অফিস থেকে ফিরে এসে বাবুরা নিমকির কাজ দেখে খুশি হয়ে দু চার আনা করে বকসিস দেয়। কাজেই ভোলার চেয়ে নিমকির

রোজগার অনেক ভাল। তা না হলে হোটেল থেকে দু'জনের প্রায় একরকম মাইনে। বাজার সওদা করতে হয় বলে ভোলা দু'টাকা বেশি পায়।

আজ ব্যাপারটা হয়েছে অন্যরকম। অবশ্য সন্তোষবাবুর কাছ থেকে যে নিমকি বকসিস পায় না তা নয়। কিন্তু কোনোদিন যা, হয় না—আজ সন্তোষবাবুর ঘরের চাবি নিমকির হাতে এসেছে। বড়লোক মানুষ। একটা ঘর নিয়ে আছে। অন্যদিন তাঁর বিছানা বালিশ রৌদ্রে দিতে নিমকির ডাক পড়লেও সন্তোষবাবু তখন ঘরেই থাকেন, ঘরে থেকে নিমকিকে এটা ওটার ফরমাশ করেন। এবং বকসিসটাও ভাল হাতেই দেন।

কিন্তু সন্তোষবাবু নেই, অথচ দরজার তালা খুলে তাঁর ঘরে ঢোকা আজ এই প্রথম।

বিশেষ করে এই কথাটাই ভোলাকে বলতে চেয়েছিল সে। তা ছাড়া বকসিসটাও কিনা আগাম দিয়ে গেলেন সন্তোষবাবু। হুঁ, আট আনা আজ ভোলাকে সে ঘুষ দিত। ভোলা থাকলে তাকে সঙ্গে নিয়ে নিমকি সন্তোষবাবুর ঘরে ঢুকত! একলা ঢুকতে তার কেমন বুক ঢিবঢিব করছিল।

॥ তিন ॥

বামুন ঠাকুর নেই, ম্যানেজার ফেরেনি। বাবুরা কেউ নেই, কেমন খাঁ খাঁ করছিল বাড়িটা, বিশেষ করে হোটেলের এই পিছন দিকটা। ভোলা থাকলে এত খারাপ লাগত না। এঁটো খাওয়া শেষ করে কাকগুলো উড়ে গেছে। একটা ধুমসো বিড়াল নর্দমার জলের কাছে গুটিসুটি বসে ড্যাবড্যাব করে নিমকিকে দেখছিল।

নিমকির হাসি পেল। কোনো কোনো পুরুষ এমন করে তার দিকে তাকায়। তা তো হবেই। হুলো, জাতের পুরুষ। তাই এমন করে দেখছে। যেন জিভের জল পড়ছে। ওটার দিকে মুখ করে বড় করে একটা ভেংচি কাটল নিমকি, তারপর তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে বাড়িটা আর এত নিরিবিলি মনে হয় না। সামনেই বড় রাস্তা। কত বাড়ি, কত লোক, রাস্তার ওধারে অগুনতি দোকানপাট। একটা হৈ-চৈ গোলমাল সারাক্ষণ লেগেই আছে। তা ছাড়া দোতলা তিনতলা চারতলা এক একটা বাড়ি। কত মানুষের বাস। মেয়েদের শাড়ি ঝুলছে, বেটাছেলেদের সার্ট প্যান্ট লুঙ্গি কত কি রৌদ্রে শুকোচ্ছে। এদিকটা শেয়ালদা, ওদিকে হাওড়ার দিকে রাস্তাটা চলে গেছে।

রেলিং-এর ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিমকি নিচে রাস্তাটা দেখল। ট্রাম বাস মোটরগাড়ি রিক্সা ঠেলা গাড়ি, গাড়ির যেন আর শেষ নেই। আর ফুটপাথ ধরে কাতারে কাতারে মানুষ ছুটছে। মানুষের শেষ নেই।

বাবুদের ঘর ঝাঁট দিতে কি বিছানা রোদে দিতে যখনই নিমকি ওপরে আসে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে কতক্ষণ সে রাস্তার

গাড়িঘোড়া দোকানপাট ও মানুষগুলোকে দেখে। আজও দেখল। কিন্তু আজ সেই সঙ্গে তার চোখ দুটো ভোলাকেও খুঁজছিল। কোথায় গিয়ে সে এখন বসে আছে কে জানে। বামুন ঠাকুর যেমন কানাই ময়রার দোকানে বসে গাঁজায় দম দেয়, ম্যানেজার যেমন কোবরেজ মশায়ের বৈঠকখানায় বসে রেসের বই হাতে নিয়ে হরসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের ফ্রক-পরা মেয়েগুলোকে দেখে, তেমনি ভোলার কোনো আড্ডা আছে বলে নিমকির জানা নেই।

কখন আড্ডা দেবে, সারাদিন খেটে খেটে বেচারা মরে যায়। দুপুরে খেয়ে উঠে ঘণ্টাখানেক সময় পায়। খাবার পরে খাবার-ঘরের একটা টেবিলের ওপর তখন শুয়ে পড়ে। শোবার সঙ্গে সঙ্গে ভুসভুস করে নাক ডাকাতে আরম্ভ করে, তারপর কলে জল আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে কাজে লাগে।

রাত্রেও ভোলা নিচে খাবার ঘরেই শোয়। দুটো টেবিল জোড়া দিয়ে তার ওপর কাঁথা বালিশ পেতে বিছানা করে নেয়। দুদিন পাখা খুলে শুয়েছিল। ম্যানেজার টের পেয়ে গালমন্দ করতে এখন আর ভোলা পাখা খুলতে সাহস পায় না। তা ছাড়া খাবার ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে তার শোবার কথা। টেবিলের ওপর শোয়া নিয়েও ম্যানেজার রাগারাগি করেছিল। মাঝখানে ভোলাকে তাই করতে হয়েছিল। সিমেণ্টের ওপর রাত্রে বিছানা পেতে শুত। পরশু থেকে আবার দুটো টেবিল জোড়া দিয়ে তার ওপর শুচ্ছে। এই নিয়ে ম্যানেজার আর হয়তো কিছু বলবে না, নিমকি অনুমান করে, কিন্তু পাখা খুলে শুলে ম্যানেজার চটে যাবেই, কেননা তাতে ইলেকট্রিকের বিল অনেক বেড়ে যায়।

রাত্রে নিমকি ভাঁড়ার ঘরে শোয়। ঘরটা ভীষণ গুমট। কিন্তু উপায় কি। তার ওপর দরজা বন্ধ করে তাকে শুতে হয়, ভোলার

মতন দরজা খুলে শুতে পারে না, মেয়েছেলে সে। গরমের রাত্রে তাকে আলু সেদ্ধ হতে হয়।

ঠাকুর ওপরের বারান্দায় শোয়, বেশি গরম পড়লে ছাদে গিয়ে শোয়। ভোলা একদিন ছাদে শুতে গিয়েছিল। ঠাকুর ধমক দিয়ে তাকে নিচে পাঠিয়ে দিয়েছে। বামুনের সঙ্গে চাকর এসে শোবে, আস্পার কত! এমন দাঁত খিঁচিয়ে উঠেছিল ঠাকুর।

ভোলাটা যেমন সরল তেমনি বোকা। তা না হলে সে বুঝিয়ে বলতে পারত, তোমার বিছানার সঙ্গে গা ঠেকিয়ে তো আমি শুচ্ছি না ঠাকুর, এত বড় ছাদের এক কোনায় তুমি শোবে, আর এক কোনায় আমি শোবো—এতে আপত্তি করার কি আছে।

কিন্তু ঐ যে, যেমন গরুর মতন মুখ বুজে থেকে বাবুদের হাজারটা ফরমাশ খাটে, তেমনি মুখ বুজে থেকে লোকের ধমক চোখ রাঙ্গানি হজম করে ছোঁড়া।

ভোলাকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। নিমকি আর রাস্তার দিকে ঝুঁকে থাকল না। হাতের কাজ শেষ করতে হবে তাকে। সন্তোষবাবুর ঘরের চাবিটা আঁচলে বাঁধা ছিল। আঁচল থেকে খুলে চাবি হাতের মুঠোয় নিল।

টানা বারান্দার সামনে সারি সারি আটটা ঘর। আটটা ঘরে ষোলজন বাবু থাকে। সন্তোষবাবু ও প্রিয়বাবুর ঘর ওদিকে। এক ফালি বারান্দা দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেছে। ওই ঘর দুটিই এ বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে ভাল ঘর। একেবারে দক্ষিণ খোলা। সামনে মাঠ। দক্ষিণের ওই খোলা বারান্দায় দাঁড়ালে ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঘুম আসতে চায়।

এদিকটায় এসে নিমকি আরো কিছুক্ষণ নিচের দিকে ঝুঁকে থাকল। পার্কে এখন লোক নেই। বিকেলে মানুষ গিস্ গিস্ করে। সকালেও

কিছু মানুষ ভিড় করে। কিন্তু বিকেলে মানুষের মাথা মানুষে খায়। বেটাছেলে মেয়েছেলে বাচ্চাকাচ্চা বুড়োবুড়ি জোয়ান ছেলে, আর ঘুরিয়ে শাড়ি পরা কাঁচা বয়সের কতো বাহারের ছুঁড়ি।

হুঁ, ছোঁড়া আর ছুঁড়ি। জোড়া বেঁধে বেঁধে হাঁটে, শব্দ করে হাসে, বেঞ্চিতে বসতে জায়গা না পেলে নিরিবিলি কোণা দেখে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। বাবুদের হোটেলে ফিরতে সন্ধ্যা হয়, রাত হয়, ওদিকে হাত একটু অবসর হলেই নিমকি ওপরে এসে দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁচা বয়সের ছোঁড়া-ছুঁড়িদের কাণ্ডকারখানা দেখে। এমন মজা পায় সে!

দুদিন ভোলাকে ডেকে দেখিয়েছিল। ভোলার মধ্যে কোনো রসকষ নেই। ধেৎ, এই দেখতে আমায় ডেকে আনলি, নিমকিকে ধমক লাগিয়ে দুদিনই ভোলা দুপদাপ করে নিচে নেমে গিয়ে আবার শিল নোড়া নিয়ে বসেছে।

সন্তোষবাবুর ঘরের দরজার তালা খুলে নিমকি ভিতরে ঢুকল। একটা চমৎকার গন্ধ তার নাকে লাগল। এসেন্সের না ফুলের গন্ধ নিমকি বুঝতে পারল না। জোরে দুবার শ্বাস টানল। এমন মিষ্টি গন্ধ, যেন তার ঘুম পাচ্ছিল। আর সব বাবুদের ঘরে এই গন্ধ নেই। মস্ত বড় একটা ড্রেসিং আয়না। কত বড় রেডিও। নিমকির চোখের পলক পড়ছিল না।

॥ চার ॥

হুঁ, সরল বোকা—আবার গোঁয়ারও বটে। ভোলার যেন আর হোটেলে ফিরে যেতেই ইচ্ছে করছিল না। পার্কের সঙ্গে লোহার রেলিং ঘেঁষে একটা কাঠবাদামের গাছ ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওই গাছতলায় ঘোঁতনা ঘুগনি নিয়ে বসে। রোজই বসে। ধারের কাছের মানুষ বলে হোটেলের ভোলার সঙ্গে তার বেশ জানাশোনা আলাপ-সালাপ হয়ে গেছে। দুজনেই দক্ষিণ দেশের মানুষ। বাপ-কাকারা চাষবাস নিয়ে আছে। কিন্তু চাষবাসের অবস্থা দেখে ভোলার বাপ যেমন ভোলাকে শহরে চাকরি করতে পাঠিয়েছে, তেমনি ঘোঁতনাও শহরে চলে এসেছে রোজগারের ধান্ধায়। কাজ-কর্মের সুবিধে করতে না পেরে ঘোঁতনা ঘুগনি ফেরি করছে।

'অনেক ভাল আছিস তুই, খুব বুদ্ধির কাজ করেছিস।' ভোলা রোজই কথাটা শোনায়, তাই ঘোঁতনা ভাবে ভোলার কাজটা মোটেই সুবিধের নয়। বেজায় খাটুনি। মাইনে কম। তার ওপর হোটেলের বাবুদের নাকি যাচ্ছে-তাই ব্যবহার! ঠাকুর ম্যানেজার যাচ্ছে-তাই গালিগালাজ করে। আজ ভোলার মুখ ভার দেখে ঘোঁতনা আর তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পেল না। তা না হলে দুজনে কত গল্পসল্প করে। ঘোঁতনা খুব মজার মজার গল্প শোনায়। ঘুগনি ফেরি করে, সারাদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কত শত মানুষ সে দেখছে। কলকাতা শহরের কত অলিগলি তাকে চষে বেড়াতে হয়।

কাল দর্জিপাড়ার মাংসের দোকানের বাসুর গল্প করছিল ঘোঁতনা। ঘুগনির জন্য বাসুর দোকান থেকে তাকে রোজ পাঁঠার মাংসের ছাঁট কিনে আনতে হয়। একদিন কলকাতা শহরে হঠাৎ হামলা বেধে

যাওয়াতে দোকানের মাংস নিয়ে বাসুকে কী বিপদে না পড়তে হয়েছিল! সেই গল্পটাই ভোলাকে শোনাচ্ছিল ঘোঁতনা।

বাসুও বাবু। লেখাপড়া-জানা ছেলে। কিন্তু তা হলে হবে কি। সংসারটা এমন হয়ে গেছে যে লুঙ্গি পরে গায়ে গেঞ্জি চড়িয়ে কোমরে গামছা বেঁধে বাসুকেও কসাই সাজতে হয়েছে। বড় নোংরা কাজ! ময়লা মাছি রক্ত নাড়িভুঁড়ি চুল ছাল রাতদিন হাতাতে হয়। তা তো হবেই। মাংসের চেয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য আর কি আছে। এখন মানুষকে যদি ভাল জিনিস খাওয়াতে হয়, একজনকে নোংরায় হাত লাগাতে হবে বৈকি। যেমন মানুষের ভাল করতে গিয়ে ধাঙ্গড়কে নর্দমার ময়লা সাফ করতে হয়, মেথরকে গু টানতে হয়। ছাগল-ভেড়ার নাড়িভুঁড়ি ছাল লোম ছাড়াতে বসে কথাটা বাসুর রোজ মনে হয়। তখন সে হাসে।

দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঐ একবার একটু সময়ই সে হাসে। আর হাসবার তার সময়ও থাকে না, হাসবার মতো কারণও থাকে না, দাঁড়িয়ে তার হাসি দেখতে আশেপাশে কেউ নেই ও বটে।

কসাই, পুরোদস্তুর কসাই হয়ে গেছে সে।

কুপিয়ে-কুপিয়ে ছাগল-ভেড়া কাটা, ছুরি চালিয়ে ছালবাকল ছাড়ানো, টেনে খিঁচড়ে নাড়িভুঁড়ি পিত্ত ফুসফুস সরানো, তারপর ধুয়ে মুছে সাফ করে দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া। আর তখন ঝাঁক বেঁধে মাছি আসবার আগে বাবুরা এসে পড়ে। তখন বাসু ভয়ানক ব্যস্ত। সিনা খাব, শিরদাঁড়া খাব, গর্দান খাব, পা খাব। যেন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বাবুরা মাংস চিবোতে হাড় চুষতে লেগে যায়। তেমন করে জিভ নাড়া ঠোঁট নাড়া হাত ঘোরানো দাঁত দেখানো। বাসু কুপিয়ে কুপিয়ে মাংস কেটে দাড়ি-পাল্লায় তুলে দেয়। তারপর আর হাঙ্গামা নেই। বাবুদের মুখের মতো হাতের থলে হাঁ করে আছে। বাসু ঝপাঝপ সেখানে মাংস ঢেলে দেয়।

কসাই, পুরোপুরি কসাই বনে গেছে সে। বাবুদের মতো ঘাড়ে

গলায় পাউডার ছড়িয়ে আদ্দির পাঞ্জাবি ঝুলিয়ে হাতে ঘড়ি বেঁধে গিন্নীদের খুশী রাখতে সাত-সকালে মাংস কিনতে ছুটে আসে না।

বরং তার অনেক আগে, রাত চারটেয় চোখের ঘুম খেদিয়ে দিয়ে, কুপি জ্বেলে পাঁঠা খাসী ভেড়া ভেড়ীর ধড় মুণ্ড আলগা করে, সেগুলো দেখে যাতে বাবুদের জিভে জল আসে, এমন চেহারা করে দড়িতে ঝুলিয়ে দেবার আগে অনেক কাণ্ডকারখানা করতে হয় তাকে। অনেক ময়লা ঘাঁটতে হয় মাছি তাড়াতে হয়।

আদ্দি সিল্ক গায়ে চড়ায় না বলে গায়ে গলায় পাউডার ঘষে না বলে তার মনে দুঃখ নেই। পেটে পিঠে ঘাড়ে গলায় চাকা চাকা দাদ গজিয়েছে বলে সে একটুও অবাক হয় না।

কসাই যেমন থাকে, কসাই যেমন হয় বাসুও তাই হয়েছে। দিনকাল যেমন পড়েছে, কসাই না হলে সে বাঁচত কি!

কিন্তু সেদিন বাসু ভয়ানক বিপদে পড়ল, ভীষণ ঠেকে গেল।

বলা-কওয়া নেই দোকান-বাজার এমন হুটহাট বন্ধ হয়ে যাবে কে জানত। কারা নাকি ট্রাম পোড়াচ্ছে বাস জ্বালিয়ে দিচ্ছে। রাস্তায় পুলিশ টহল দিচ্ছে। পাঁচজন একত্র হয়েছে দেখলে লাঠি দিয়ে তাড়া করছে, কাঁদুনে গ্যাস ছাড়ছে।

অথচ বাজারের অবস্থা চমৎকার ছিল। এদিক-ওদিক দু'চারটা মুখেভাতের খবর ছিল। বাসু দুটো বড় দেখে খাসী কেটেছিল। প্রায় সাবাড় করে এনেছিল বেচে। বেলা বারোটা নাগাদ সব পরিষ্কার করে দিত। কিন্তু কপাল মন্দ। এগারোটা বাজল কি গোলমাল বেধে গেল। হামলার ধাক্কায় শহরটা হিমসিম খেয়ে গেছে। ওপাশের কাপড়ের দোকান মনোহারী দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, এপাশের দর্জির দোকান মিষ্টির দোকান মায় চুল কাটার সেলুনটাও বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ বাসুর দোকানে তখনো চার কিলোর ওপর মাংস দড়িতে ঝুলছে। এখন উপায়!

কোথায় হামলা হচ্ছে আর এখানে কুকুরটা পর্যন্ত রাস্তায় বেরোচ্ছে না। তা ছাড়া বাবুদের প্রাণে ডর বেশি। বাবুপাড়ার পথঘাট চোখের পলকে ফাঁকা হয়ে গেছে।

তবু যদি এটা শেয়ালদা-বৈঠকখানা বাজার হত, কি তালতলা মৌলালী রাজাবাজার, নিদেন ছাতুবাবুর বাজার হত তো চোখ বুজে সকালের মাল বিকেলে সে চালিয়ে দিতে পারত। তাই তারা চালায়। বাসু সব বাজারের খবর রাখে। রাতের বাসি মাল পর্যন্ত পরদিন চালিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু এটা দর্জিপাড়া। ভয়ানক নাক এ-তল্লাটের মানুষের। চর্বিটা মেটুলিটা পর্যন্ত তিনবার শুঁকে তবে থলেতে ঢোকাবে।

এখন উপায়! এবেলার মাংস ওবেলা চলবে না। আর ওবেলা দোকান খুলতে পারবে তার ভরসা আছে কিছু? পাড়াটা গুম মেরে আছে। যেন রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া এবেলা যেমন হয়েছে যতটা হয়েছে—ওবেলা দাঁত দিয়ে কেউ কুটোটিও কাটবে না। জল খেয়ে দোরে খিল এঁটে সব শুয়ে থাকবে। কাঁদুনে গ্যাস, পুলিসের লাঠিকে বাবুদের ভীষণ ভয়। তার ওপর এখন-তখন পাড়ায় মিলিটারী গাড়ি ঢুকছে।

তার মানে বাসুর চার কিলোর ওপর মাংস পচতে বসেছে। হাতের গুণে দাড়িপাল্লার টানে সেটাই পুরো পাঁচ কিলো হয়ে খদ্দেরের থলেতে উঠে যেত। তার মানে কড়কড়ে চল্লিশটা টাকা জলে ভাসতে চলেছে।

লাঠি গ্যাস মিলিটারি গাড়ি না—এতবড় একটা লোকসানের ভয়ে বাসু হিমসিম খেয়ে গেছে।

দোকানের ঝাঁপ অনেকক্ষণ সে বন্ধ করে দিয়েছে।

খদ্দের থাকলে তো দোকান, খাইয়ে থাকলে তো খাদ্য। কাক-শালিকটাও যেখানে দেখা যাচ্ছে না সেখানে দোকান খুলে বসে থাকবে সে কার আশায়!

'অন্য দিন এমন সময় বাসু দোকান বন্ধ করে। এক ছটাক মাংস ঘরে পড়ে থাকে না, সব বেচে শেষ করে দেয়। ধুয়ে-মুছে ঘর সাফ করে রাস্তার টিউবওয়েলে চান করে আসে। ঘরে এসে উনুন ধরিয়ে ভাত চাপিয়ে দেয়। বাচ্চাটাকে নাওয়ায় খাওয়ায়। দোকান ঘরই বাসুর থাকবার শোবার ঘর। পিছনের অন্ধকার মতন চার হাত ছ হাত কোঠা সমেত দোকানটা পেয়ে যাওয়াতে সুবিধা হয়েছে। রান্না খাওয়া সেখানে হয়, বাচ্চাটাও থাকে। যখন ঘুমোয়, ঘুমোয়। না হলে পায়ে দড়ি পরিয়ে চৌকাঠের সঙ্গে ওটাকে বেঁধে রাখতে হয়। বেঁধে না রাখলে হামা দিয়ে এখানে চলে আসে। দাড়িপাল্লার ওপর, কাটা মাংসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে এক ঝামেলা।

সেই কখন থেকে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে।

কাঁদুক। সব দিক থেকে সে কসাই হয়ে গেছে।

না হয়ে উপায় কি। তিন মাসের বাচ্চা কোলে রেখে মা যদি আর একটা মানুষের সঙ্গে পালিয়ে যায় তো বাপ কসাই হবে না কি। সে এক ঘটনা। আর এক কেচ্ছা। বাসু এখন সে-সব মনে করতে চায় না। ভুলে আছে, ভুলে গেছে। তার মাথা গরম দড়ির ওই দুটো ঠ্যাং ও শিরদাঁড়াটার জন্য। জলন্যাতা দিয়ে ওটা জড়িয়ে রেখেছে। তবু শালা মাছি বিজবিজ করছে। ধোঁয়ার রঙের ক্ষুদে মাছি, নীল রঙের বড় বড় গুয়ে মাছি, কালো মাছি, সবুজ সবুজ ঢাউস মাছি, সব এসে জুটেছে।

না, বাসু নিজে মাংস খায় না। কথাটা সে চিন্তা করছিল। মাংস হাতিয়ে হাতিয়ে, নাড়ি-ভুঁড়ি রক্ত পিত্ত ঘেঁটে ঘেঁটে মাংস জিনিসটার ওপর তার ভয়ানক ঘেন্না ধরে গেছে, অরুচি ধরে গেছে। হুঁ, চিন্তা করছিল সে, যদি নিজে খেত না হয় আড়াই শ গ্রামের মতো রেখে বাকিটা বিলিয়ে দিত। এমনি দড়িতে ঝুলে পচবে নষ্ট হবে! রাত চারটেয় মাল কাটা হয়েছিল। এখনই হলদে রং ধরে গেছে।

বেলা দুটো বাজে। সন্ধ্যা পর্যন্ত টিকবে না। বরফটরফ দিয়ে রাখলে থাকত। এ-পাড়ার বাবুরা বরফ দেওয়া মাংস খায় না। বরফ পচা মাছ খুব খায়। কিন্তু মাংসের বেলায় তরতাজা চাই।

কিন্তু বিলোবে কাকে! কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসুর ভিতরটা পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠল। বিলোবে কাকে? মাগনা মাংস খাওয়াবে সে পাড়ায় এমন লোক আছে নাকি। শহরের পাঁচটা কসাইকে যে চোখে দেখা হয় বাসুকেও সেই চোখে দেখে বাবুরা। চোখের আগায় সেই সন্দেহ, নাকের ডগায় সেই ঘেন্না। আর দোকানে এসে কী যাচ্ছে-তা ব্যবহার, কী সব কথাবার্তা! ‘দ্যাখো বাবা, বাসি পচা মালের টুকরো-টাকরা এর সঙ্গে আবার চালিয়ে দিও না যেন—উঁহু, পাল্লা ঠিক নেই, পাষাণ আছে—বাটখারা সরিয়ে সোজা করে ধর—তোমাদের কসাইদের কিছু বিশ্বাস নেই, না পার দুনিয়ায় হেন কাজ আছে নাকি।’ বা, ‘খাসীর নামে ছাগী চালিয়ে দিচ্ছ না তো—জ্যান্ত পাঁঠা কেটেছিলে? না কি ভাগাড় থেকে মরা ভেড়া তুলে এনে বেচতে লেগে গেছ···তোমাদের কসাইদের কল্‌জে বলে কিছু আছে নাকি—না পার হেন দুষ্কর্ম দুনিয়ায় নেই—চোখ ফেরালেই বুকে ছুরি বসাও’—

এঁরা ভদ্রলোক, জামায়-কাপড়ে বাবু।

বাসু থুথু ফেলল।

এমন যাদের মুখ, এমন যাদের ব্যবহার তাদের কিনা মাগনা মাংস খাওয়াবার কথা সে চিন্তা করছে। যাক পচে। যদি ওবেলায় দোকান খুলতে না পারে রাস্তার কুত্তাকে বিলিয়ে দেবে। বাবুপাড়ার বাবুদের চেয়ে কুত্তাগুলোর তবু দিল বলে একটা জিনিস আছে।

দর্জির দোকানের রাখহরি, মিষ্টির দোকানের প্রহ্লাদের কথাও চিন্তা করল বাসু। সব একরকম। বাবুপাড়ায় এসে সব বাবু বনে গেছে। সেই গুমর, সেরকম কথাবার্তা—চোখে-মুখে সন্দেহ নিয়ে তাকানো। মাংস

বিলোতে গেলে ভাববে শালা এখন ঠেকে গেছে—পরে সুবিধা আদায় করার তালে থাকবে। শার্টটা পাঞ্জাবিটা মাগনা সেলাই করিয়ে নেবে—প্রহ্লাদ ভাববে, বাসু শালা ধারে দইটা মিষ্টিটা নিয়ে যাবে—তারপর দাম আদায় করা যাবে না। বিনি পয়সার মাংস খাওয়ার খোঁটা দেবে।

যেমন মানুষ তেমন তাদের মন। বাসু সব ব্যাটাকে চিনে নিয়েছে। সব শালা কসাই—ছোটলোক। মাংস না বেচলে কি আর কসাই হতে পারে না! না, বিলোনো টিলোনো চলবে না। এসব বাজে চিন্তা। যদি ওদিকে হামলাটা আর না বাড়ে—ওবেলা এ তল্লাটে ছুটোছাটা বেচা-কেনা চলবে না এখনই হলপ করে কিছু বলা যায় না। আর এমন পাড়া, শালা এক আধটা হোটেল-ফোটেলও নেই। না হয় দামটা একটু কম করে ধরে সন্ধ্যাসন্ধ্যি গিয়ে সবটা মাংস সে দিয়ে আসতে পারত। হোটেলে এসব চলে। কিন্তু এ পাড়ায় হোটেল থাকবে কেন। বাবুরা গিন্নীদের হাতের সুখের রান্না খেয়ে কূল পায় না। রেস্টুরেন্টটা ভরসা ছিল। সেখানেও মাংসটা দিব্যি ছেড়ে দেওয়া যেত। কিন্তু দোকানে তালা ঝুলিয়ে ব্যাটা সেই যে পালিয়েছে আজ আর ফিরবে বলে মনে হয় না। তিলজলায় থাকে গৌরাঙ্গ। বাস না চললে ফিরবে বা কেমন করে। হামলার ঠেলায় গাড়ি ঘোড়া সব যেন গর্তে ঢুকে পড়েছে।

বাসু একবার উঠে দাঁড়াল। ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে রাস্তাটা দেখল। মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে। এমনিও এসময়টা বাবুপাড়ার রাস্তা ফাঁকা থাকে। তার ওপর ভাদ্র মাস। রোদের কী তেজ! কংক্রীট তেতে আগুন হয়ে আছে।

এই নিয়ে সতেরোবার মাংসের গায়ে জলের ছিটা দেওয়া হয়েছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে জল শুকিয়ে ন্যাতাটা খরখরে হয়ে যাচ্ছে। বাসু লক্ষ্য করল, হলদে রংটা মজে গিয়ে কেমন একটা মেটমেটে রং ধরতে আরম্ভ করেছে। তার মানে এইবেলা পচতে শুরু করবে। এই আধ

ঘণ্টার মধ্যে মাছির সংখ্যাও তিনগুণ বেড়ে গেছে। মাংসের গায়ে আর ধরছে না। দেওয়ালে মেঝেয় লাখ দেড়লাখ ঘুরে বেড়াচ্ছে। পচা গন্ধ বদ গন্ধ খুঁজে বার করতে মাছির জুড়ি জীব দুনিয়ায় আর নেই বুঝি। অন্যদিন বাসু ঘরে একটু ফিনাইল ছিটিয়ে দেয়। আজ তার সেসব কিছুই করতে ইচ্ছা করছিল না। যেন মাংসটার সঙ্গে সেও পচে যাচ্ছে। একটু পরে কালো সবুজ নীল মাছিগুলো তার হাতে-পায়ে-মাথায়-মুখে বসবে। এখন থেকেই বসতে আরম্ভ করেছে। আর ওধারে হামা দিয়ে চৌকাঠের কাছে এসে বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করছে তো করছেই। পা বাঁধা আছে বলে চৌকাঠ ডিঙোতে পারছে না। বাসু সেদিকে তাকাচ্ছে না। তাকিয়ে করবে কি। খিদেয় ওটার জিভতালু শুকিয়ে গেছে, চোখের কিনারে কালি পড়েছে, লাল ঠোঁট দুটো নীল হয়ে যাচ্ছে। চোখ না ফিরিয়েও বাসু টের পায়। মরুক! মরে যাক। বাসু তাই চাইছে। ওটা মরলে একদিক থেকে সে নিশ্চিন্ত হয়। এতবড় একটা ঘটনা, বুকের মস্ত দগদগে ঘা-টা সে ভুলতে পারে। এখন ওটা ন' মাসের হয়েছে। যখন ওটা তিনমাসের তখন শালী নাগর জুটিয়ে পালিয়ে গেছে। মা যদি বাচ্চা ফেলে রেখে চলে যেতে পারে বাপ কসাই হবে না কেন। কি, এক একদিন বাসুর এমনও ইচ্ছা করে, ধড় থেকে মুণ্ডটা আলাদা করে ছাল-বাকল তুলে ফেলে খাসী পাঁঠার সঙ্গে ওটাকেও দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়। একটা দুধের বাচ্চা মানুষ করা কি চাট্টিখানি কথা! বাসু আর যন্ত্রণা সইতে পারছে না। সময় বুঝে দিন বুঝে আজ যেন আরো বেশি চেঁচাচ্ছে।

'এই চুপ!'

ধমক খেয়ে বাচ্চাটা চুপ করে গেল।

চুপ থেকে টলটলে চোখে চেয়ে রইল।

মাংস কাটার ছুরিটা হাতে নিয়েছে বাসু। যেন এখনি গলাটা

আলাদা করতে চাইছে সে। তারপর ওটার দিকে চেয়ে থাকে।

বাচ্চাটা এবার ফিকফিক করে হাসে।

অর্থাৎ বাপ এমন করে তাকিয়ে আছে দেখে ধরে নিয়েছে এখনি কোলে তুলে নেবে !

কিন্তু বাসু কোলে নেয় না। তবে হাত থেকে ছুরিটা নামিয়ে রাখে। অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে লম্বা নিশ্বাস ফেলে ।

এমন সময়।

'ভিতরে আছেন ?'

'কে !' বাসু চমকে উঠলো। পিছন দিকের দরজার কাছে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার দিকের, সদরের দিকের দরজা বন্ধ, তাই বুঝি গলি ঘুরে এসেছে কেউ। 'কে গা ?'

'আমি।'

ঠাণ্ডা আওয়াজ। মিষ্টি গলা।

ভাদ্রের জ্বালা, ভিতরের এই গুমট, মাছি, আর চারধারে এমন হাঙ্গামা-হুজ্জতের মাঝখানে মিঠা গলার আওয়াজটা মিশ্রীর সরবতের মতন লাগছিল বাসুর কাছে। উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে ওধারে গিয়ে সে দরজা খুলে দিল।

কিন্তু গলার আওয়াজ শুনে বাসু ভেবেছিল দর্জির বৌ, রাখহরির গিন্নী। রাখহরিটা কসাই। কাটা মাংস না, কাটা কাপড়ের ব্যবসা করেই কসাই বনে গেছে। কিন্তু বৌটা ভাল। দিল বলে একটা জিনিস আছে। কথাবার্তা মিষ্টি, ব্যবহারটা ভদ্র। দু'একদিন দর্জির ঘরে গিয়ে বাসু বুঝে নিয়েছে।

কিন্তু এ যে অন্য মানুষ।

বাসুর চোখ গোল হয়ে গেল।

মানুষটা এত মোটা, পিছনের সরু দরজা দিয়ে ঢুকতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তা হলেও ভিতরে এসে দাঁড়াল। চুল কাটা সেলুনের

শশীর গিন্নী। গায়ে-গতরে মাংস কি করে হয় শশীর বৌয়ের দিকে তাকিয়ে বাসু ভাবছিল। আরো কদিন ভেবেছে সে। একদিনের একটা মাংসের দাম আদায় করতে অনেকদিন তাকে শশীর ঘরে যেতে হয়েছে।

আজ বাসু আবার নতুন করে ভাবছিল।

দোর ভেজিয়ে দিয়ে শশীর বৌ পাল্লার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ায়। হাঁপাচ্ছে। হয়তো পুলিসের কাঁদুনে গ্যাসের ভয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তাটা পার হয়েছে। পাল্লার গায়ে পিঠ ঘষছে মানুষটা। কথা বলার সময় নেই। ঘামাচির যন্ত্রণায় পিঠটা জোরে জোরে ঘষছে কাঠের সঙ্গে। পিঠে কাপড় নেই। পিঠেও নেই বুকে নেই। আঁচলটা কোলের কাছে দলা করে ধরে রেখেছে শশীর গিন্নী। এত মাংস যার শরীরে তার ভয়ানক গরম লাগবারই কথা। আর সারা গায়ে কত ঘামাচি!

বাসু অবাক হয়ে ঘামাচি দেখছিল।

ঘামাচি আর স্তূপ স্তূপ মাংস।

অন্যদিন বাসু ওপর ওপর দেখেছে মেয়েছেলেটাকে।

আজ খোলামেলা অবস্থায় দেখল।

সিমেণ্টের থলের মতো মাই দুটো কোমরের কাছে নেমে এসেছে মাংসের ভারে। কত বড় পিঠ-কাঁধ। হাত দুটো কী ভীষণ মোটা! চর্বি ও মাংসে ঠাসা এমন বিরাট শরীর দেখতে ভয় করে, মাথা ঘোরে। বাসুর মাথা ঘুরত, ভয় পেত সে। কিন্তু মানুষটার গায়ের রং এত ফরসা, এমন চমৎকার মাজা-ঘষা চামড়া! বরং ড্যাবড্যাব করে সে প্রকাণ্ড শরীরটা দেখতে লাগল। যেন ঐ শরীরের আরো দশ কিলো মাংস জমা হলেও খারাপ লাগবে না। কদাকার দেখাবে না।

চোখ বুজে মানুষটা এতক্ষণ পিঠ চুলকাচ্ছিল।

এবার চোখ খুলল। যেন লজ্জা পেল। ফোলা-ফোলা গাল দুটো একটু লাল হল। বাসু এমন করে তাকিয়ে আছে!

'কি মনে করে—এমন অবেলায় যে!' যেন লজ্জা ভাঙ্গতে বাসুই আগে কথা বলল, হাসল।

কিন্তু মোটা মানুষটা হাসল না। ফর্সা গালে টোল পড়ল না। আঁচলটা বুকের ওপর টেনে নিল। তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'আমার আর বেলা-অবেলা। ভরদুপুরে কোথা থেকে মিন্‌সে মদ গিলে এসেছে। সঙ্গে তিন সাঙ্গাত।'

'বটে!' বাসু বড় করে ঢোক গিলল। মদ খেয়ে বাড়িতে ঢুকেই শশী একটা দুষ্কর্ম করেছে বৌয়ের চোখ দুটো দেখে সে বুঝতে পারল। 'তারপর!'

'ঘরে পা দিয়েই দুম্ করে লাথি।'

'কেন?'

'মাংস রান্না হয় নি কেন। বলছিল যেখান থেকে পারিস মাংস এনে এখনি রেঁধে দে শালী।'

'ছিঃ ছিঃ!' বাসু বিড় বিড় করে উঠল! 'শশীটা একেবারে গোল্লায় গেছে। বাইরে ছাইভস্ম গিলে ঘরে এসে বৌকে মারধর করে—নরকেও ঠাঁই হবে না এমন পাষণ্ডের।' বাসু একটু থামল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছল শশীর বৌ।

'দেখি কোথায় মেরেছে।' বাসু ঝুঁকে দাঁড়াল। শশীর বৌ আঁচলটা আবার শরীর থেকে নামিয়ে দিল। বিশাল চওড়া, মাংসে ঠাসা, ফরসা ধবধবে পিঠটা বাসুর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

'আহা, এই তো, এখানে পশুটা লাথি মেরেছে। হুঁ, কেমন লাল হয়ে আছে জায়গাটা।' বাসু হাত রাখল, আঙ্গুল বুলোতে লাগল সাদা সুন্দর পিঠটায়। 'এমন মোলায়েম শরীর এমন নরম মাংস!' বাসু আবার বিড় বিড় করছিল। 'কি করে কসাইটার লাথি মারতে ইচ্ছে করল এই পিঠে অবাক লাগে।'

এবার শশীর বৌ ফিক করে একটুখানি হাসল।

দুঃখের হাসি, বাসু বুঝল। কেননা হেসে ফেলে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'আপনি বলছেন একথা, আর মিনসে রাতদিন বলছে, তুই মর, মরে যা, তুই এত মোটা, তোর শরীরে গাদা গাদা মাংস ছাড়া কিছু নেই, একটা হতকুচ্ছিত মেয়েছেলে তুই।'

'বটে!' বাসুও এবার একটুখানি হাসল। দুঃখের হাসি। 'এই মাংস তোর ভাল লাগে না, এই শরীর তো তোর ভাল লাগবার কথা নয়। মদ গিলে যখন বেহুঁস হয়ে থাকিস তখন কি আর তুই মানুষের মধ্যে থাকিস—পশু।'

ড্যাবড্যাবে চোখে বাসু আবার সাদা পিঠ পেট বুকের খোলা অংশটা দেখতে লাগল। যেন এবার আঁচলটা দলা পাকিয়ে আরো নিচে নামিয়ে দিল শশীর বৌ। বাসুর আবার ভয়ানক ইচ্ছা করছিল ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়, লাল জায়গাটায় আঙ্গুল বুলিয়ে দেয়। কিন্তু দেখতে না দেখতে আবার যেন রাজ্যের লজ্জা এসে মোটা মানুষটাকে ঘিরে ফেলল, ফোলা ফোলা গাল দুটো লাল হয়ে উঠল, আঁচলটা তুলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'দিন মাংসটা নিয়ে যাই, দেরি হলে মিনসে আবার কিলচড় মেরে একেক্কার করবে।'

'তা বটে, তা বটে!' মদ না, যেন অন্য কিছুর নেশায় বাসু বেহুঁস হয়ে পড়েছিল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ন্যাতা-জড়ানো মাংসটা দড়ি থেকে নামিয়ে আনল। 'সবটাই লাগবে—সাঙ্গাতেরা এয়েছে যখন, চার কিলোর ওপর এই সবটাই লেগে যাবে, কেমন না?'

'হুঁ।' ঘাড় কাত করতে কষ্ট হয় মোটা মানুষটার, তাই থুতনিটা নাড়ল। 'সবটায় কুলোবে কিনা কে জানে।' শশীর বৌ নতুন করে হাসল, আর হাত বাড়িয়ে মাংসটা ধরল। 'একটু যেন গন্ধ বেরিয়েছে

না, মজে গেছে বাসি হয়েছে?' নাকের দু'পাশের মাংস কুঁচকে উঠল মানুষটার।

বাসু হাসল না, বরং আগের চেয়েও লম্বা করে নিশ্বাস ছাড়ল।

'ভাল জিনিস তো তার ভাল লাগবে না, ওই শরীর, তাজা মাংস গরম রক্ত, এমন নরম থলোথলো চর্বি-চামড়া কখনো ভাল লাগতে পারে মাতালের?' আঙুল দিয়ে বাসু বৌয়ের শরীরটা দেখাল, তারপর চোখ নেড়ে ন্যাতায় জড়ানো মাংসটা দেখাল: 'মাতালের ভাল লাগবে এই জিনিস, পচা বাসি মাংস, ওই তার খাদ্য।'

কথাটা নতুন করে উপভোগ করে শশীর বৌ আর একবার হাসল, তারপর মাংস নিয়ে মোটা শরীরটা টেনে টেনে আস্তে আস্তে পিছনের সরু দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাচ্চাটা আর কাঁদছিল না। যেন কেঁদে কেঁদে এখন দম ফুরিয়ে গেছে, নেতিয়ে পড়েছে। আর ঘরের যত মাছি ওটার মুখে মাথায় পেটে পিঠে বসে বিজবিজ করছে। বাসু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। দেখতে দেখতে এক সময় তার চোখে জল এসে গেল। বিড়বিড় করে কি বলছিল সে। যেন পুরোপুরি কসাই হতে পারছিল না বলে নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল বাসুর। রাগ হবার কথা। শশীর বৌয়ের কাছ থেকে মাংসের দামটা সে রাখতে পারল না।

গল্পটা শেষ করে ঘোঁতনা হাসছিল। ভোলাও হাসছিল। ভোলার ইচ্ছে ছিল এমন মজার ব্যাপারটা নিমকিকে শোনাবে। কাল বিকেলে সময় পায়নি।

আজ আর বলা হবে কি? আজ ভোলার মনের অবস্থা অন্য রকম।

B. B. COLLEGE LIBRARY
55691
25.3.74

॥ পাঁচ ॥

দশ পয়সার বাদাম কিনে ভোলা একটু দূরে গিয়ে রেলিং-এর গায়ে ভর দিয়ে বাদাম খেতে লাগল।

অন্য দিন এ সময় বাদাম তেলেভাজা যা হোক একটা কিনে আবার হোটেলে ফিরে যায়। নিমকিকেও দিতে হয়। দুজনে বসে এক সঙ্গে খায়। গল্প করে। কোনোদিন নিমকির পয়সায়, কোনোদিন ভোলার পয়সায় এসব খাদ্য কেনা হয়।

নিমকিই বেশি দিন পয়সা দেয়। সেই কোন্ সকালে হোটেলের দুখানা বাসি আটার রুটি দিয়ে চা খাওয়া হয়। তারপর ভাত খেতে বেলা একটা। খিদেয় পেট জ্বলতে থাকে। কাজেই এ সময়টা একটা কিছু মুখে দিয়ে জল খেয়ে পেটটা ঠাণ্ডা করতে হয়।

কিন্তু আজ ভোলার ভাবনা অন্যরকম। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলেছে হোটেলের চাকরি আর করবে না। রোজ অত গালাগাল সহ্য হয়!

আর ঐ একটা মেয়ে! দিন দিন বড় হচ্ছে আর এই হোটেলে আদরটা যেন বেড়ে যাচ্ছে ছুঁড়ির। এখন ছুঁড়ি কথায় কথায় হাসে। যেমন ম্যানেজারের ইচ্ছে শালার বামনারও তেমনি ইচ্ছে সব এঁটো বাসন ভোলা ধুয়ে ফেলুক, বাসন মাজা জল তোলা বাটনা বাটা—যত ভারি কাজ একলা ভোলাই করবে, নিমকি কেবল বাবুদের খাওয়ার সময় জল দেবে আর বাবুদের বিছানাপাটি রৌদ্রে দেবে রুমালটা গেঞ্জিটা কেচে দেবে।

এসব কাজে কথায় কথায় বকসিস। ম্যানেজারের ইচ্ছে, বাবুদেরও তাই ইচ্ছে, নিমকি দুটো পয়সা বেশি পাক।

বেলেঘাটার বস্তিতে ওর মা মুড়ি ভাজে। কি করে একদিন খোঁজ পেয়ে ম্যানেজার বেলেঘাটা ছুটে যায়। মা-মেয়ে এক সঙ্গেই সেদিন ম্যানেজারের সঙ্গে চলে এসেছিল। হোটেলের চাকরিতে মেয়েকে ঢুকিয়ে দিয়ে মা খুব খুশি। সেদিনই নিমকির মাকে প্রথম দেখে ভোলা।

জালার মতন একটা পেট। মিশি মেখে দাঁতগুলো যা হয়েছে। বড় বড় হাত-পা। কালো কুচকুচে রং। এতবড় একটা মানুষের এমন রোগা শালিকের বাচ্চার মতন কী করে একটা মেয়ে হয় ভেবে সেদিন ভোলার খুব অবাক লাগছিল।

নিমকির নাকি সেদিন দশ বছর বয়স ছিল। *ম্যানেজারকে যা বলছিল নিমকির মা। খুব একটা খাটাখাটনি* পারবে না, বরং একটু দেখে শুনে কাজ দেবেন। এখনো বাচ্চা। হুঁ হুঁ। তাই দেওয়া হবে—তোমার মেয়ে আমার মেয়ের মতন। খুব একটা খাটাব না। ভারি কাজ কিছু ওকে করতে হবে না। আমার চাকর আছে। নিমকির মা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিল।

দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেছে। হিসেব করলে আজ নিমকি চৌদ্দয় পা দিয়েছে। এখন চোখে মুখে কথা বলে। আগে চুপ করে থাকত। ভোলার সঙ্গে থেকে প্রায় সব কাজই করত। কাজে ফাঁকি দিতে চাইত না। দরকার হলে ভোলার হাতের কাজ কেড়ে নিত। আর খুব মন খারাপ করে থাকত। মা আবার কবে তাকে দেখতে বেলেঘাটা থেকে আসবে সারাদিন ভাবত।

প্রথম প্রথম হপ্তায় দুদিন তিনদিন করে মা এসে নিমকিকে দেখে গেছে। নিমকি কান্নাকাটি করত। এখানে ভাল লাগে না। আমায় ঘরে নিয়ে চল। মা তখন মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বোঝাত, একটু বড় হ— তখন তোকে আর হোটেলের কাজে রাখব না, ভাল ঘর ভাল বর দেখে তোর বিয়ে দেব। এখন দিনকতক কটা পয়সা কামিয়ে নে,

অসময়ে তোর বাবা মরে গেল, মুড়ি ভেজে আমাকে পেট চালাতে হয়, কটা পয়সা হাতে না জমলে তোর বিয়ে দেব কেমন করে। তোর রোজগারের একটা পয়সাও আমি খরচ করব না, সব বিয়ের জন্য জমা থাকবে।

এত সব শুনে নিমকি আর কাঁদত না। তার রোজগারের পয়সা মা বিয়ের জন্য জমিয়ে রাখছে শুনে মন দিয়ে সে হোটেলের চাকরি করতে লাগল।

নিমকির মা এখনো মেয়েকে দেখতে আসে। তবে খুব কম, মাস পার করে একদিন আসে। এখন কিন্তু নিমকি আর মার কথা এত বলে না, যেন মার কথা ভাবেও না। যেন এখন তার মাথায় অন্য চিন্তা। চিন্তাটা কী ঠিক বোঝা যায় না।

তবে ভোলা বেশ দেখতে পায়, সারাদিন নিমকি কী যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে, সারাক্ষণ হাসছে, একটু সেজেগুজে থাকতে পারলে খুশি হচ্ছে।

ভোলার সঙ্গে ভাব রাখতে চাইছে বটে—কিন্তু বোঝা যায় গোড়ার দিকে এখানে এসে হোটেলের কাজে লাগবার পর ভোলা ছাড়া যেমন অন্য কাউকে সে চিনত না, সুখদুঃখের কথা বলতে তেমনি ভোলা ছাড়া আর কেউ তার ছিল না, কাউকে সে জানত না—এখন ঠিক সেই ভাবটা নেই, কেমন যেন ওপর ওপর ভোলার সঙ্গে খাতির রাখছে—মুখে বলছে, ভোলা, তুই আছিস বলে আমি হোটেলে চাকরী করতে পারছি—তুই না থাকলে কবে আমি মার কাছে চলে যেতাম, এসব জায়গায় আমার একটুও ভাল লাগত না। কিন্তু সেটা ছুঁড়ির মুখের কথা।

তার মনের মধ্যে যেন অন্য চিন্তা, অন্য একটা ঘোর নিয়ে সে মেতে আছে।

তা তো হবেই, বাবুরা কথায় কথায় তাকে ঘরে ডাকছে, কথায় কথায় বকসিস দিচ্ছে।

উহুঁ, এসব উপরিপাওনা পয়সা মার হাতে সে দেয় না। মাস গেলে কেবল মাইনের টাকাটা মা এসে নিয়ে যায়। আর বকসিসের রোজগারটা নিমকি সাবান স্নো কিনে মাথার তেল কিনে ব্লাউজ কিনে খরচ করছে, মাঝে মাঝে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে।

দুদিন ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। ফাঁক বুঝে কখনো একলাও যায়। অবশ্য দূরের কোনো ঘরে একলা যেতে সাহস পায় না। এপাড়ায় যে সিনেমা ঘরটা আছে ওখানেই দুপুরের দিকে চলে যায়। চুপি চুপি ছবি দেখে আবার ফিরে এসে হোটেলের কাজে লাগে। কেননা একলা সিনেমায় গেছে জানতে পারলে ম্যানেজার রাগারাগি করবে।

এদিকে মাসান্তে ফি বার মেয়ের মাইনের টাকা নিতে এসে নিমকির মা ম্যানেজারকে বলে যায়, 'মেয়ে এখন একটু বড় হয়েছে, একটু চোখে চোখে রাখবেন দাদা।'

ম্যানেজার একগাল হেসে মাথা নাড়ে।

'সে আর বলতে হবে ? তোমার মেয়ে আমারও মেয়ে। আমার এখানে যতক্ষণ আছে তোমার মেয়ে, মনে করবে একটা আশ্রমে আছে। হুঁ, আমার বাবুরা এত ভাল—ভয়ানক সচ্চরিত্রের মানুষ এঁরা। তা ছাড়া বাইরের কোনো লোক যে এই হোটেলের গেট্ পার হয়ে ভেতরে ঢুকবে সেটি হবার জো নেই। আমার ঠাকুর চাকর দারোয়ান সবাই বিশ্বাসী। ঘরের লোকের মতন।'

শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে নিমকির মা, বেলেঘাটা ফিরে যায়।

কিন্তু ভোলা বেশ দেখতে পাচ্ছে, তলে তলে নিমকি বেশ সেয়ানা হয়ে উঠেছে।

ভোলার বয়স কত এখন! ভোলা ঠিক বুঝতে পারে না। কেননা নিজের বয়সের হিসেব তার জানা নেই। তবে সে অনুমান করে সতেরো আঠারো হবে। কেননা ইতিমধ্যে তার যখন একটু গোঁফ

গজিয়েছে। ঠাকুর একদিন বলছিল, তুই কুড়ি বছরের ঢেঁকি হয়ে গেছিস। তোর চেহারা দেখলে বোঝা যায়।

ঠাকুর যে তার বয়স বাড়িয়ে বলেছে ভোলার তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শালা চব্বিশঘণ্টা গাঁজার দমের ওপর আছে। তার মাথার কিছু ঠিক আছে নাকি। বামনা শালাকে ভোলা ছু চোখে দেখতে পারে না।

হুঁ, কথা হচ্ছে নিমকি! ভীষণ চালাক হয়ে গেছে ছুঁড়ি। এক একটা ব্যাপারে ভোলাকে বোকা বানিয়ে দেয়।

তা ভোলা বোকা বনুক। এতে তার নিজের মনে একটু দুঃখ হয় না। গাঁয়ের ছেলে। বোকাসোকা মানুষ তো সে বটেই। শহুরে চালাকির সঙ্গে সে পাল্লা দিয়ে পারবে কেন। কিন্তু কথা হচ্ছে ঐ বেলেঘাটার মুড়ি ভাজাওয়ালীর মেয়ে নিমকি।

ভোলা ঠিক বুঝে গেছে, বেশি চালাক হতে গিয়ে ছুঁড়ি একদিন ঘোল খাবে। এমন ফাঁদে সে পড়বে! আশ্রম—ম্যানেজারের কথাটা মনে হলে সময় সময় ভোলার হাসি পায়। এখানে এই হোটেলের সব বাবু সাধু। সবাই মহাপুরুষ।

তাই না নিমকি যখন খাবার ঘরে এধারের বাবুদের টেবিলে জল দিয়ে ওধারের টেবিলের বাবুদের জল দিতে ঘুরে যায় তখন এধারের টেবিলের বাবুরা নিজেদের মধ্যে এমন বিশ্রী চোখ টেপাটেপি করে। কদিন দেখেছে ভোলা। আর কদিন ধরে নিমকিকে দিয়ে বিছানা ঝাড়া, লেপ তোষক রোদে দেওয়া, গেঞ্জি রুমাল কাচার যেন হিড়িক পড়ে গেছে।

যেন নিমকির হাতের কাচা গেঞ্জিটা গায়ে চড়াতে পারলে, কি রুমালটা পকেটে পুরতে পারলে বাবুরা দারুণ খুশি হয়। যেন এই সুখের তুলনা হয় না।

তা ছাড়া ভোলা যখন সিগারেট নিয়ে পান নিয়ে এটা ওটা নিয়ে

ওপরে যায়, তখন ঘরে ঘরে ওই সব সাধু বাবুরা নিমকিকে নিয়ে কী সব আলোচনা করে ভোলা কি শোনে না।

ভোলার সামনেই তারা এসব বলে। যেন ভোলা কালা। নাকি বাবুরা ধরে নিয়েছে ভোলার মতন বোকারাম এই দুনিয়ায় আর দুটো হয় না। ঘরের ইট কাঠ চেয়ার টেবিল কি তক্তপোষের মতন কোনো একটা কিছু। সুতরাং তার সামনে হোটেলের ওই ছুঁড়িকে নিয়ে লাগাম ছেড়ে কথা বলতে আপত্তি কী।

ভোলা শুনে যায়। কিছু বলে না। বলার দরকার কী। কেন না কিছু বলতে গেলে নিমকি হয়তো ভাববে বাবুদের কাজকর্ম করে দিয়ে ও যে দুটো বাড়তি পয়সা রোজগার করছে তাতে বুঝি ভোলার হিংসে হচ্ছে, বাবুদের নামে বানিয়ে সে এখন একথা সেকথা তাকে শোনাতে চাইছে।

এইজন্যই ভোলা চুপ করে আছে। শুধু দেখছে জল কতদূর গড়ায়।

এখন নিমকি তার পয়সা দিয়ে কিছু কিনে খাওয়াতে চাইলে ভোলা আর খাচ্ছে না। কদিন ধরে খাচ্ছে না। পরশু তাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে চাইছিল। ভোলা যায়নি। বলেছে, সিনেমা দেখতে তার ভাল লাগে না।

তাই তো, আগে না বুঝে দুদিন নিমকির পয়সায় সে সিনেমা দেখে এসেছে। এইজন্য ভোলার এখন অনুতাপ হচ্ছে।

না, আজ তার মেজাজ খুব বেশি খারাপ হয়ে গেছে। তার আঙুল নিয়ে কান নিয়ে খোঁচাখুঁচি করে ছুঁড়ি একটা ঝগড়া বাঁধাল, আর ঠাকুর ম্যানেজার একসঙ্গে ছুটে এসে তাকেই উল্লুক টুল্লুক বলে গেল। এসব আর সহ্য হচ্ছে না। বুঝি তাও সে সহ্য করত। একটু পরেই কিনা ছুঁড়ি ওপরে চলে গেল। তারপর যেন খুশির তুফান বুকে নিয়ে হাসতে হাসতে নিচে নেমে এল। নিশ্চয় আজ কোনো

বাবুর কাছে ভাল বকসিস মিলেছে। তা ছাড়া, তার আঁচলে একটা চাবি বাঁধা ছিল। আজ কোন্ ঘরের বাবুদের বিছানা বালিশ রোদে দেবে গেঞ্জি রুমাল কাচবে কে জানে!

সব দেখে দেখে তার কেমন যেন ঘেন্না ধরে গেছে মেয়েটার ওপর। একটুও ইচ্ছে করছিল না আর হোটেলে ফিরে যায়।

বাদামের খোলাগুলি কোল থেকে ঝেড়ে ফেলে সে উঠে দাঁড়াল।

মাথার ওপর রোদ চনচন করছে।

দেশে ফিরে যাওয়ার কথা সে ভাবছে বটে, কিন্তু ফিরে গেলে তার বাবা যে মেজাজ খারাপ করবে তাও সে চিন্তা করছিল। চাষবাসের অবস্থা মোটেই ভাল না।

আঃ, যদি এই শহরেই আর কোনো জায়গায় একটা কাজটাজ তার জুটে যেত!

মোড়ের ওই বড় চায়ের দোকানটা তার খুব ভাল লেগেছে।

তার বয়সী আরো দু তিনটি ছেলে সেখানে চাকরি করে। দু তিনদিন ঘোরাঘুরি করে ওই দোকানের একটা ছেলের সঙ্গে একটু ভাব করেছে! নাম শম্ভু। দক্ষিণ দেশেই বাড়ি। ছেলেটা ভাল। শম্ভুকে সে বলে রেখেছে যদি দোকানে নতুন লোকটোক নেয়, তার জন্য যেন সে একটু চেষ্টা করে।

এখন হাঁটতে হাঁটতে একবার ওদিকে যাবে কিনা ভোলা চিন্তা করল।

এ সময়টা চায়ের দোকানে খদ্দের খুব কম থাকে। কাজেই শম্ভুরা একটু অবসর থাকে। কথা বলার সুবিধে হয়।

যেন ওদিকে মুখ করে ভোলা হাঁটতে আরম্ভ করে আবার থমকে দাঁড়াল। বাদাম গাছটা পার হয়ে পার্কের এই কোনার দিকটায় এলে হোটেলের দোতলার বারান্দাটা ঠিক চোখে পড়বেই। ওটা দক্ষিণের বারান্দা। সঙ্গে সঙ্গে ভোলা সেদিকে চোখ তুলল। তার বুকের

ভিতরটা কেমন ধড়াস করে উঠল। এক নম্বর ঘরের দরজা খোলা। তার মানে ওটা সেই বড় মানুষের ঘর। সন্তোষবাবুর ঘর।

একটু আগে সন্তোষবাবু বেরিয়ে গেছে। হোটেলের দরজার সামনে ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছিল। ট্যাক্সি চড়ে সন্তোষবাবু চলে গেছেন। ভোলা নিজের চোখে দেখেছে। নিমকির সঙ্গে রাগারাগি করে ভোলাও তখন গেট-এর বাইরে চলে এসেছে।

না, এর মধ্যেই ফিরে আসবে, তা হতেই পারে না। তবে কি—

—নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল ভোলা। একটা কিছু চিন্তা করল। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

॥ ছয় ॥

অডিকোলনের গন্ধে, রজনীগন্ধার গন্ধে ঘরের ভিতরটা ভুরভুর করছিল। কত বড় একটা রেডিও! কেমন চকচকে ঝকঝকে ড্রেসিং আয়না! খাটটা কী সুন্দর!

অন্য ঘরে বাবুরা তক্তপোষের বিছানায় শোয়। আর সেসব ঘরের বাবুদের কীই বা আছে! দড়িতে ময়লা লুঙ্গি ঝুলছে। ভেজা তোয়ালে ঝুলছে। টেবিল নেই কারো, জানালার তাকের ওপর সাবানের বাক্স দাঁতন আর বড় জোর এক আধটা ক্রিম কি পাউডারের কৌটা চোখে পড়ে। আর প্রত্যেকের শিয়রের কাছে একটা করে ট্রাঙ্ক বা সুটকেশ। আর কিছু না। আর যদি এক আধজোড়া ছেঁড়া জুতো বা চটি কারো তক্তপোষের তলায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

সকলের আরসি চিরুনিও নেই। একজনেরটা দিয়ে আর একজন কাজ চালায়।

কথাটা অনেকদিন নিমকি চিন্তা করেছে। সব বাবু অফিসে চাকরি করে, কিন্তু এত কম জিনিস কেন তাদের ঘরে।

বাবুদের ট্রাঙ্ক সুটকেশের ভিতর কী আছে জানার উপায় নেই। কেননা অফিসে যাবার সময় বাবুরা বাক্সের চাবি সঙ্গে নিয়ে চলে যায়, কেবল ঘরের চাবিটাই নিমকির হাতে তুলে দিয়ে যায়, কিন্তু তা বলে ট্রাঙ্ক বা সুটকেশের চাবি যে কেউ একদিন ভুল করেও ফেলে রেখে যাবে, আজ পর্যন্ত নিমকি দেখল না। এই ব্যাপারে বাবুরা ভয়ানক হুঁসিয়ার।

তাই নিমকির কতদিন হাসি পেয়েছে।

বিছানাপাটি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করার জন্যে তোষক বালিশ রোদে

দেবার জন্যে গেঞ্জি রুমালে সাবান মাখাবার জন্য বিশ্বাস করে এ-ঘরের ও-ঘরের বাবুরা, বলতে গেলে প্রায় সারাদিনের জন্যে, দরজার চাবিটা নিমকির জিম্মায় রেখে যায়। যেন বাবুরা এটা বুঝে গেছে, যদি নিমকি দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢোকে, আর হঠাৎ তার মাথায় কোনোদিন কুমতলব চাড়া দেয় তো এমন কোনো জিনিস সে সারা ঘরে খুঁজে পাবে না, যা কিনা হাত দিয়ে তুলে সরানো যায়। সাবান তেল স্নো পাউডারের ডিবি? ময়লা লুঙ্গি গামছা? না কি ছেঁড়া জুতো দাঁত ভাঙ্গা চিরুনি?

বাবুরা বুঝে গেছে, এসব জিনিস নিমকি হাত দিয়েও ছোঁবে না।

কেননা তাতে নিমকির নিজেরই ক্ষতি। বরং এই যে ঘরে ঘরে বাবুরা তাকে দিয়ে টুকিটাকি কাজগুলো করিয়ে চার ছ' আনা করে বকসিস দিচ্ছে, প্রায় রোজই যদি কোনো না কোনো ঘর থেকে এভাবে পয়সা পেতে থাকে তো মাসের শেষে তার রোজগারটা মোটামুটি ভালই দাঁড়ায়। একটা পাউডারের ডিবি কি একটা ফাটা আয়না সরিয়ে সে করবে কী! এতটা বুদ্ধি নিমকি মাথায় রাখে।

হুঁ, তবে কিনা ট্রাঙ্ক সুটকেশ। তেমন লোভ হলে নিমকি তালা ভাঙ্গতে পারে বৈকি। বাবুরা তাও নিশ্চয় চিন্তা করেছে। কিন্তু মেয়েছেলে, এতটা সাহস নিমকির হবে না, বা তালা না ভেঙ্গে বাক্সটাই তুলে নিয়ে সরে পড়বে—এসব সিঁদেল চোরের কাজ, বেটাছেলের কাজ, রোগা শরীর নিয়ে ওইটুকুন একটা মেয়ের পক্ষে একটা ভারি বাক্স মাথায় করে দোতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামা কোনোদিনই সম্ভব হবে না।

এসব ভেবে নিমকি নিজের মনে হাসে। এইজন্যই না বিশ্বাস করে বাবুরা ঘরের চাবি তার হাতে তুলে দিয়ে যায়।

এবং এটাও নিমকি চিন্তা করেছে, ট্রাঙ্ক সুটকেশের ভিতরেও তেমন কিছু মূল্যবান জিনিস থাকবে না। অর্থাৎ কোনোদিন যদি নিমকির

লোভও হয় এবং অতিরিক্ত দুঃসাহস করে তালা ভেঙে ফেলে ভেতরে হাত ঢোকায় তো কিছু জামা কাপড় মশারী লেপের ওয়াড়, হয়তো ব্যবহার করা হয় না, ছিঁড়ে গেছে, এমন সব কাপড়-চোপড় ছাড়া আর কিছুই সে পাবে না। আর যদি কিছু কাগজপত্র পুরোনো বইটই পেয়ে যায়।

একদিন তিন নম্বর ঘরের অটলবাবুর স্যুটকেশটা একটু হাত দিয়ে তুলে পরীক্ষা করেছিল নিমকি। ভীষণ ভারি। যেন লোহালক্কড়ে বোঝাই হয়ে আছে। লোহালক্কড় কেউ বাক্সের ভিতর তালা বন্ধ করে রাখে না, নিমকি তখন মনে মনে বলেছিল, পুরোনো কাপড়-চোপড় ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না। সোনাদানা কি টাকাপয়সা থাকলে বাক্স এত ভারি হত না। তবে কি না এমন বোঝাই করে বাক্সের ভিতর কেউ সোনাদানা রাখে না। কাজেই নিমকির যা অভিজ্ঞতা, হোটেলের বাবুরা ভীষণ হুঁসিয়ার।

এখানে তারা দামী জিনিস কিছু রাখে না।

কেন রাখবে। দেশের বাড়িতে তাদের বৌ আছে ছেলেমেয়ে আছে। মূল্যবান কিছু থেকে থাকলে সেখানেই বাবুরা সব রেখে আসবে। নিমকি তো হোটেলের চাকরি নিয়ে অবধি দেখে আসছে, একটা ছুটিছাটা পেলো কি অমনি হোটেলের বাবুরা দেশে ছুটে গেল। কেউ কেউ ঠিক শনিবার অফিস ফেরতা ট্রেন ধরে, আর ফেরে সেই সোমবার বিকেলে। তার মানে বাড়ি থেকে রওনা হয়ে হাওড়া শেয়ালদা স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে সোমবার সোজা অফিস করতে চলে যায়। তারপর অফিস সেরে আবার পাঁচ-ছদিনের জন্য হোটেলে আসে।

হোটেলের সঙ্গে তাদের শুধু অফিস করার সম্পর্ক, তার বেশি কিছু না। কাজেই দামী জিনিস ভাল জিনিস তারা এখানে রাখতে যাবে কোন্ দুঃখে। এখানে ঐ ক'খানা জামা কাপড় গামছা সাবান টুথব্রাস আর একটা বাক্স ও বিছানা।

এঘরে ঢুকে নিমকি আজ তাজ্জব বনে গেল। কত জিনিসপত্র চারদিকে !

এতবড় একটা টেবিল। টেবিলে ফুলদানীটা কত বড় ! কত রজনীগন্ধা গোঁজা রয়েছে !

দেওয়ালে ভাল ভাল ছবি। সব দামী ফ্রেমে বাঁধানো।

কেমন ধবধবে বিছানা সন্তোষবাবুর ! নেটের মশারীটা এক পাশে গুটিয়ে রাখা হয়েছে।

একটা বাক্স না এখানে। ট্রাঙ্ক সুটকেশ নিয়ে চার পাঁচটা বাক্স। চামড়ার সুটকেশই তিনটে। চিরুনিটা কী সুন্দর ! নিমকির হাতে নিতে ইচ্ছে করল। ড্রেসিং-টেবিলে স্নো পাউডার শাম্পু কত কী সাজানো রয়েছে।

হুঁ, দুটো জানালাতেই পর্দা আছে। চৌকাটের কাছে ফুলপাতা আঁকা কত বড় একটা পাপোস। গদি আঁটা চেয়ার সোফা সেট— কী নেই সন্তোষবাবুর। কাঁচ লাগানো ছোট আলমারীর ভিতর কাপ ডিস, চায়ের চামচ, কাঁটা চামচ কত কী নিমকির চোখে পড়ল।

অন্য বাবুদের ঘরের মতন এ ঘরেও মাথার ওপর পাখা ঝুলছে। কিন্তু এ ঘরে একটা টেবিলফ্যানও রয়েছে। পাখাটা দেখতে ভারি সুন্দর। হাওয়াটা খুব মিষ্টি হবে, নিমকি মনে মনে বলল।

আর ব্রাকেটে ঝুলানো প্যাণ্ট সার্ট টাই ছাড়াও কোঁচানো ধুতি সিল্কের পাঞ্জাবি দু জোড়া করে রয়েছে। নিশ্চয়ই এ সব ব্যবহার করা হয়ে গেছে বা হচ্ছে, শিগগিরই ধোপাবাড়ি যাবে। কাজেই চার পাঁচটা বাক্সে যে আরো কত কী থাকবে নিমকি সহজেই আন্দাজ করতে পারল।

তাই তো, বড়লোক, অনেক টাকা মাইনে পায়। নিমকি শুনেছে দেশের বাড়িতে সন্তোষবাবুর বৌ-ছেলেমেয়েরা রয়েছে। অন্য সব বাবুর মতন ছুটি পড়তে হুট করে তিনি দেশে যান না ঠিকই, কিন্তু তা

বলে যে সেখানে কিছুই না রেখে সব জিনিসপত্র তাঁর এই হোটেলের ঘরে এনে ঢুকিয়েছেন, এটা কোনো কাজের কথা নয়।

তার মানে সেখানে যেমন তাঁর অনেক কিছু আছে, এখানেও অনেক কিছু দিয়ে তিনি এই ঘর সাজিয়েছেন। যার থাকে তার সব জায়গায়ই কিছু না কিছু থাকে।

অথচ বিশ্বাস করে আজ এই ভদ্রলোকও নিমকির হাতে ঘরের চাবি দিয়ে গেছেন। তাঁর বিছানা ঝেড়েপুছে রাখবে নিমকি, তোষক বালিশ রৌদ্রে মেলে দেবে।

কিন্তু এমন না যে, তাঁর ট্রাঙ্ক সুটকেশ-এ তালা নেই। থাকলে কী হবে, ওই যে রেডিওটা, টেবিলফ্যানটা, পিতলের ওপর মিনা করা সুন্দর ফুলদানীটা—ট্রাঙ্ক সুটকেশ সরাতে না পারুক, বাইরে যে সব জিনিস ছড়ানো রয়েছে তার যে-কোনো একটা কি দুটো নিমকি সহজেই তুলে নিয়ে যেতে পারে। ব্রাকেটে ঝুলানো সিল্ক টেরিলিনের জামাগুলোই কী কম দামী!

তাই ভেবে নিমকির হাসি পেল, অন্য বাবুদের ঘরে কিছুই প্রায় থাকে না, তাতেও যেন নিমকিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে তাদের আটকাচ্ছে।

তা না হলে ছেঁড়া পুরোনো জামাকাপড় কি মশারী লেপের ওয়াড়ে বোঝাই করা বাক্সে বড় বড় তালা ঝুলবে কেন।

আর এত সব ভাল ভাল জিনিস খুলে মেলে রেখেও' কিনা এই ভদ্রলোক তার কাছে ঘরের চাবি রেখে গেল। এর নামই পুরোপুরি বিশ্বাস। তার ওপর আগাম একটা টাকা বকসিস।

একটা অন্যরকম খুশিতে নিমকির বুকের ভিতর ডগমগ করে উঠল।

ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে মুখটা দেখল। কেবল মুখ কেন, সবটা শরীরের ছবি নিমকি দেখতে পেল।

আর অন্য ঘরের বাবুদের ছোট ছোট আরসি দিয়ে কেবল মুখখানাই

সে এতদিন দেখেছে। মুখ ও গলার খানিকটা অংশ। এখানে এতবড় আয়নায় তার বুক কোমর হাঁটু, এমনকি পায়ের পাতা দুটিও কি চমৎকার ফুটে উঠেছে।

তাইতো, বেশ লম্বা হয়ে গেছে সে। বুকের দিকে চোখ পড়তে ঠোঁট টিপে নিমকি হাসল। এবার সে হাত বাড়িয়ে স্নোর কৌটোটা তুলে নিল। কতবড় কৌটো! অন্য বাবুদের মতন এইটুকুন কৌটো না। কৌটোর মুখ খুলে নাকের কাছে ধরতে তার যেন ঘুম পেল। এমন ঠাণ্ডা মিষ্টি গন্ধ।

আর কোনো ঘরে এত ভাল স্নো নেই। আঙুলের ডগায় বেশ খানিকটা তুলে নিয়ে সে গালে ঘষল। গাল দুটো সঙ্গে সঙ্গে মাখনের মতন তুলতুলে হয়ে গেল। মুখটা বেজায় ফরসা দেখাতে লাগল।

বলতে কি, যেন নিজেকে হঠাৎ চিনতেই কষ্ট হচ্ছিল তার। অন্য সব বাবুদের স্নো মুখে মেখে নিমকিকে এত সুন্দর কোনোদিন দেখায় না। অবশ্য এখনই যদি ভোলা এসে এঘরে ঢুকত, নিমকিকে গালাগালি দিত।

বাবুদের একটু স্নো ক্রিম মুখে মাখলে ভীষণ চটে যায় সে। না বলে নিমকি পরের জিনিসে হাত দিয়েছে। এটা চুরি ছাড়া আর কিছু না। বিশ্বাস করে বাবুরা ঘরের চাবি দিয়ে গেছে বলে নিমকি চুরি করে রোজ এই বাবু সেই বাবুর স্নো ক্রিমের কৌটো থেকে গাদা গাদা তুলে নিয়ে মুখ ঘষবে—খুব অন্যায় করেছে সে, ভোলা রাগে গজগজ করতে থাকে, চোখ লাল করে বাবুদের জিনিস আবার ঠিক জায়গায় রেখে দিতে নিমকিকে রীতিমত শাসাতে আরম্ভ করে।

নিমকি কিন্তু ভোলার শাসানি কি চোখ রাঙানি গায়ে মাখে না। বরং হি-হি করে হাসে। এবং বাবুদের কৌটো থেকে আরো খানিকটা স্নো ক্রিম তুলে নিয়ে গালে ঘষে।

'আমার সাজতে খুব ভাল লাগে, বুঝলি ভোলা, এইজন্যই বাবুদের

একটু আধটু জিনিস চুরি করে মুখে মাখি। আর তো কিছু নিই না। চুরি করার মতন বাবুদের আর কী-ই বা আছে তুইই বল্।’

ভোলা তখন গুম হয়ে থাকে।

আজ অবশ্য সে সঙ্গে নেই, তা না হলে অন্যদিন দরজার তালা খুলে বাবুদের ঘরে ঢুকতে ভোলাকেও সে সঙ্গে রাখে। বিছানাপাটিতে হাত লাগাবার আগে বা সাবান মাখাবার জন্য ময়লা গেঞ্জি রুমাল ঘর থেকে বের করার আগে নিমকি রোজ বাবুদের একটু পাউডার স্নো মুখে মেখে নেয়, হাতের কাছে আরসি পেলে মুখখানা দেখে নেয়, ভাল চিরুনি পেলে চুলটা আঁচড়ে নেয়।

‘আসল কথা, তুই একটা বাজে মেয়ে হয়ে গেছিস, নষ্ট হয়ে গেছিস।’ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভোলা আবার গজরাতে থাকে। ‘তা না হলে পরের জিনিস চুরি করে মুখে মেখে এত সাজবার লোভ কেন তোর?’

‘আহা!’ নিমকি তখন হাসতে হাসতে উত্তর করে, ‘হোটেলের বাসন মাজি জল তুলি বলে কি একটু সাজতে নেই—তোর যেমন কথা।’

‘তাই তো দেখছি, কদিন থেকেই সাজগোজের দিকে খুব মন দিয়েছিস, এদিকে বাবুদের ঘরে ঘনঘন আসা-যাওয়াও সুরু হয়েছে, কথায় কথায় বকসিস-টকসিসও খুব মিলে যাচ্ছে, একদিন এমন ফাঁদে পড়বি—তখন মজা টের পাবি।’ যেন এতক্ষণ পর আসল কথাটা ভোলার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

নিমকিও চুপ থাকে না। জোরে মাথা ঝাঁকায়। ‘বাবুরা খুব ভাল, সব সাধু মহাপুরুষ শুনিস্‌নি, ম্যানেজার মাকে বলে দিয়েছে, এই হোটেলে যতদিন আছি আমার গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না।’ কথা শেষ করে নিমকি আরো জোরে হাসে। ‘এখানে ফাঁদ টাঁদের বালাই নেই।’

যেন ভোলার সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়েও নিমকি একটু রঙ্গরস করে। যেমন ভোলার এগারো আঙুল আড়াই কান নিয়ে নিমকির যখন তখন রঙ্গরস করতে ইচ্ছা করে। ঠিক তেমন করেই শরীরটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সে বেদম হাসে আর বাবুদের পাউডারের ডিবি থেকে এতটা পাউডার ঢেলে নিয়ে গালে গলায় ঢালে।

'তুই একটু মাখ না, মাখবি?' সেদিন চার নম্বর ঘরের রজনী বাবুর পাউডারের ডিবিটা সত্যি ভোলার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল নিমকি। যেন রঙ্গ করবার জন্যেই এটা করেছিল ও।—'খানিকটা মেখে দ্যাখ, তোর গায়ের সব ঘামাচি মরে যাবে, এই দ্যাখ্ না, চুরি করে বাবুর ট্যালকম পাউডার রোজ আমি গায়ে মাখছি বলে আমার চামড়া কেমন পালিস চকচকে হয়ে গেছে।'

সেদিন একটু বাড়াবাড়ি করেছিল বৈকি নিমকি। গায়ের চামড়া দেখাতে ভোলার সামনে ব্লাউজের গলার দিকটা সামান্য ফাঁক করে ধরেছিল।

ভোলা তখনি চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। যেন রেগে গিয়ে আর একটা কথাও সে মুখ থেকে বের করতে পারছিল না। তখনি দুপদাপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

গেঁয়ো মানুষ, বোকা—সরলও বটে, অতিরিক্ত সরল। নিমকি আর এক দফা নিজে নিজে হেসেছিল। গাঁ থেকে আসুক—তা হলেও তো ক'বছর হয়ে গেল ভোলার এই কলকাতা শহরে—তাও কিনা এমন একটা চালু হোটেলে চাকরি করছে, একটু যদি বদলাত ছোঁড়া। সাংঘাতিক একটা চাষাড়ে গোঁ নিয়ে চলাফেরা করে।

যেন এইজন্যই ওকে চটাতে ভাল লাগে নিমকির, গোঁয়ারটার জন্য ভিতরে ভিতরে একটু যে মায়া না হয় এমন না।

বলতে কি, সময় সময় নিমকি চিন্তা করে, চিন্তাটা এদিকে হয়েছে তার, বেশ বড় মেয়ে হয়ে গেল সে দেখতে দেখতে—আর এই একটা

হোটেলে, কেবল বেটাছেলে নিয়ে যেখানে কারবার, যাকে বলে পুরুষের রাজ্য, এক নিমকি ছাড়া মেয়েছেলের নাম গন্ধও নেই যেখানে—এই অবস্থায় সে যে এখানে চাকরি করছে, তার পাশে ভোলা আছে বলে। ম্যানেজার বলে বটে, বাবুরা সব সাধু মহাপুরুষের মতন, কিন্তু কার মনে কী আছে কে বলতে পারে! সবাই তো সকলের ওপরটা দেখে। ভিতর দেখছে কে।

কাজেই পুরুষকে দিয়ে মেয়েছেলের যে বিপদ—হুট করে কোনোদিন তেমন একটা বিপদে যে নিমকি না পড়বে, হলপ করে তা কে বলতে পারে!

ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতন বাবুদের সামনে সে যাচ্ছে বটে, জলটা এটা ওটা—যখন যে যা চাইছে এগিয়েও দিচ্ছে, চাবি রেখে গেলে বাবুদের ঘরে ঢুকে বিছানা ঝাড়ছে, তোষক বালিশ রোদে দিচ্ছে, রুমাল গেঞ্জি কেচে দিচ্ছে।

ধরা যাক, ঠিক এই কাজটা করতে গিয়ে একদিন বিপদ ঘটল।

এমন একটা সময় আসে যখন হোটেলটা শ্মশানের মতন হয়ে যায়। যেমন আজ—এখন। একটি বাবু কোনো ঘরে নেই। সব অফিস করছে। ঠাকুর গাঁজায় দম দিতে কানাই ময়রার দোকানে চলে গেছে, ম্যানেজার কোবরেজের বৈঠকখানায় বসে আছে। ভোলাও বেরিয়ে গেছে।

আর নিমকি তালা খুলে এই ঘরে ঢুকল।

এখন, ঐ যে বলা হল, কার মনে কী আছে, সন্তোষবাবু যদি হুট করে ফিরে আসেন, ফিরে এসে তার ঘরে ঢোকেন, ঘরে ঢুকে দেখেন একটা উঠতি বয়সের মেয়ে ছাড়া এতবড় হোটেলটায় কাক প্রাণীটিও নেই, আর সেই সুযোগ পেয়ে ভদ্রলোক—হোক না বয়স্ক মানুষ, পুরুষদের ভীমরতি ধরতে কতক্ষণ—হুঁ, সুযোগ পেয়ে ভদ্রলোক—

নিমকি অবশ্য তার পরের ছবিটা ভাবতে পারে না, তার কেমন গা কাঁপে পা কাঁপে ভাবতে গেলে।

কিন্তু নিমকির কেন জানি একটা বিশ্বাস আছে, যেখানেই থাকুক না, বিপদের সময় ভোলা ঠিক ছুটে আসবে, ছুটে এসে তাকে রক্ষা করবে, যেমন আগুন লাগলে ঝাঁপ দিয়ে মানুষ আর একটা মানুষকে বাঁচায়, তেমনি ভোলাও দরকার হলে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে।

অবশ্য ভোলা সম্পর্কে এই বিশ্বাসটা প্রথম থেকেই তার মনে কেন যে শিকড় গেড়ে আছে নিমকি বুঝতে পারে না।

হয়তো সরল বলে, গোঁয়ার বলে। কেননা পৃথিবীতে দেখা গেছে সরল ও গোঁয়ার মানুষগুলো খাঁটি হয়, সাচ্চা হয়। তাদের মধ্যে কোনো কূটপ্যাঁচ থাকে না। ন্যায়কে তারা ন্যায় বলবে, অন্যায়কে অন্যায় বলবেই, আর যেখানে অন্যায় সেখানে তারা লড়বেই, বুকের রক্ত দিয়ে লড়বে।

কাজেই এত বড় হোটেলটার এতগুলো পুরুষের মধ্যে একমাত্র ভোলাই যেন তার সাহস, ভোলাই তার বিপদের বন্ধু।

ভোলার আঙুল নিয়ে কান নিয়ে নিমকি ঠাট্টা তামাসা করে বটে, তাকে এটা সেটা নিয়ে চটায়ও খুব, আবার নিমকি এ-ও টের পায়, তার মনের কোনায় ভোলার জন্য একটা টান রয়েছে, একটুখানি মায়া সব সময়ই জেগে আছে।

কদিন ধরে তার পয়সায় কিছু কিনে দিলে ভোলা খাচ্ছে না, সিনেমা দেখতে বললে সিনেমা দেখছে না, কিন্তু আজ নিমকি মনে মনে ঠিক করেছে, সন্তোষবাবুর কাছ থেকে যে-টাকাটা পাওয়া গেছে, তার থেকে আট আনা নিমকি জোর করে হলেও ভোলাকে গছিয়ে দেবে। দরকার হলে পুরো টাকাটাই দিয়ে দেবে। তার জন্যই তো ভোলা তখন ঠাকুর ও ম্যানেজারের কাছে এমন বেশি গালাগাল খেল। খুব খারাপ লাগছিল নিমকির। যেমন করে হোক ভোলার রাগ অভিমান ভাঙাতে হবে।

।। সাত ।।

সন্তোষবাবুর দামী ক্রিমের কৌটা থেকে ক্রিম তুলে নিয়ে গালে ঘষতে ঘষতে নিমকির বুকটা সত্যি খুব দুরদুর করছিল। অন্য বাবুদের ঘরে ঢুকলে তার যে একটু আধটু ভয় না করে তা নয়, কিন্তু আজ এই ঘরটার এত সব দামী জিনিসপত্র ছড়ানো জমকালো চেহারাটাই যেন নিমকিকে কেমন ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিল।

এমন না যে সন্তোষবাবু এসে এখনই ঘরে ঢুকছে, তা হলেও তো বড়লোক, পয়সাওলা মানুষ। পয়সাওলা মানুষের মেজাজ টেজাজ একটু অন্যরকম থাকে। কলকাতা শহরের কেচ্ছাটেচ্ছা যা তার কানে আসে।

অর্থাৎ এই ঘরে একজন পয়সাওলা মেজাজী মানুষ থাকে—এই চিন্তাটাই নিমকিকে বেশি ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর এইজন্যই ভোলার কথা তার বার বার মনে পড়ছিল। ভোলা তার সাহস, ভোলা তার বন্ধু।

হুঁ, চৌদ্দ পনেরো বছর বয়স একটা মেয়ের পক্ষে অনেক বয়স। বিশেষ করে যখন বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় থেকে তাকে চাকরি করতে হয়। এখন মা তার বিয়েটিয়ের কথা আর উল্লেখই করছে না।

কেন করছে না নিমকি তা-ও বোঝে।

হোটেলে থেকে নিমকি খাওয়া পরা পাচ্ছে। তেল সাবানটা তার এখানকার বাবুদের বকসিসের পয়সায় হয়ে যায় এবং সিনেমা টিনেমার খরচও।

কাজেই নিমকির মাইনের কড়কড়ে টাকাগুলো মাস শেষ হলে তার মা এসে হাত পেতে নিয়ে যায়।

নিমকি তার মাকে চেনে, ভীষণ টাকার খাঁকতি। একলা বিধবা মানুষ হলে কী হবে, মুড়ি ভাজছে, ঠোঙ্গা বানাচ্ছে, ঘুঁটে শুকিয়ে বেচছে, আর খবর পেলেই ছুটে যাচ্ছে, পাড়ার কোন্ বাড়ির কোন্ বৌয়ের ছেলেপুলে হবে, দাইয়ের কাজটাও কী করে যেন শিখে গেছে নিমকির মা। সুতরাং এদিক দিয়েও রোজগারটা মন্দ না। বেশ ভাল পয়সা জমিয়েছে মানদা—লোকে তো তাই বলে।

এত পয়সা দিয়ে মা কী করবে, নিমকি মাঝে মাঝে চিন্তা করে। সব পয়সা কি তার বিয়ের জন্য খরচ করবে!

নিমকি কিন্তু মোটেই তা আশা করে না। বরং নিমকি বুঝে গেছে, আরো বেশ কিছুদিন মা তাকে এই হোটেলের চাকরিতে রাখবে। মাসের শেষে এমন কড়কড়ে টাকাগুলো সত্যই বন্ধ হয়ে যাক, তার মা কিছুতেই চাইবে না। নিমকির রোজগার বন্ধ হতে দিতে তার মা'র বুক টনটন করবে।

কাজেই আরো কতকাল নিমকিকে এই বাসনমাজা জলতোলার কাজে লেগে থাকতে হবে তার কিছু ঠিক নেই।

কাজেই এখানে ভোলাই তার একমাত্র ভরসা। কথাটা শুনতে খারাপ লাগে, কোন্‌দিন কোন্ বাবুর হঠাৎ ভীমরতি ধরবে আর হোটেলের এই যুবতী মেয়েটাকে, হুঁ চাকরানীটাকে—বাবুরা তাই ভাবে কিনা, চাকর চাকরানীর জীবনের কোনো দাম নেই, তাদের শরীরের কোনো দাম নেই—সুতরাং সুযোগ পেলে একদিন নিমকিকে জাপটে ধরবে—সেদিন, একটু আগে যা বলা হয়েছে, অসম্ভব বিশ্বাস নিমকির এই ভোলার ওপর, ভোলাই তাকে বাঁচাবে—গোঁয়ার ছেলে জোয়ান ছেলে—ঐ ভীমরতি পাওয়া বাবুর পেটে যদি কেউ লাথি মারতে পারে তো একমাত্র ভোলাই পারবে, ভোলাই লড়বে, আর কেউ না।

মুখে ক্রীম মাখা শেষ করে তেমনি কাঁপা কাঁপা হাতে নিমকি সন্তোষবাবুর জমকালো চিরুনিটা ড্রেসিংটেবিল থেকে তুলে নিল।

বুকে ভয় নিয়েও নিমকি ভাবছিল, এমন দামী চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ানো নিমকির কোনোদিনই হবে না।

তার মা যদি তার জমানো সব টাকা খরচ করেও নিমকির বিয়ে দেয়, তবু নিমকি এমন বর পাবে না, যার কিনা এমন একটা চিরুনি বৌকে কিনে দেবার ক্ষমতা থাকবে। ভাগ্য, ভাগ্য ছাড়া এমন দামী খাটের বিছানায় কেউ শুতে পায়? এত দামী তেল কেউ মাথায় দিতে পারে? এমন চকচক ঝকঝকে ঘর আলো করা ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় কেউ মুখ দেখতে পারে?

চুল আঁচড়ানো শেষ করে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিমকি প্রকাণ্ড আরসিটার মধ্যে নিজের মুখ দেখল, শরীর দেখল, তারপর চিরুনিটা রেখে দিল। তারপর কেমন যেন একটা ক্লান্তি, একটা অবসাদ নিয়ে খাটের দিকে যাচ্ছিল সে। তোষক বালিশ তুলে নিয়ে বারান্দার রেলিং-এ রৌদ্রে মেলে দেবে, তারপর খাট জাজিম ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করা—

ভাবতে ভাবতে নিমকি বড় টেবিলটার সামনে একবার দাঁড়াল। মিনা করা পিতলের ফুলদানীটা তাকে টানছিল। এত সুন্দর জিনিস সে আর দেখেনি।

হাত বাড়িয়ে ফুলদানী একবার ছুঁয়ে দেখল।

টেবিলের ওপর আরো কত জিনিস। এটা বুঝি টর্চবাতি। কত-বড় বাতিটা! এটা? কাগজ কাটা ছুরি। ওটা?

এমন অদ্ভুত ছাইদানী নিমকি জীবনে দেখেনি। রুপোর বাটির মতন চকচক করছে। যেন একটা রুপোর বাটিই। এভাবে এটা ওটা দেখতে দেখতে হঠাৎ নিমকি টেবিলের একটা টানার ওপর হাত রাখল। ভেবেছিল সে চাবি দেওয়া আছে, কিন্তু সামান্য টানতেই টানাটা সামনের দিকে চলে এল।

বেশ একটু অপ্রস্তুত হল সে। তাড়াতাড়ি ওটা আবার ঠেলে

ভতরে ঢুকিয়ে দিতে গেল, কাগজপত্র ছাড়া যেন আর কিছু নেই, কিন্তু হঠাৎ টানার কাগজপত্রের ফাঁকে চকচকে কিছু একটা তার চোখে পড়ল।

নিমকি তার রোগা সরু হাতটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। জিনিসটা তুলে আনল। তার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। সোনার আংটি ! পাথর বসানো প্রকাণ্ড আংটি।

শ্বাস ফেলতে পারছিল না নিমকি। আঙ্গুলে পরল। তার আঙুলে বড় হয়। বোঝা গেল পুরুষের আংটি। সন্তোষবাবুর আংটি।

নিমকির গলার ভিতরটা শুকিয়ে যাচ্ছিল। আংটিটা রেখে সে এদিক ওদিক দেখল। শূন্য ঘর। জানালার দিকে তাকাল। পার্ক দেখা যাচ্ছে। কেউ নেই ওখানে। রাস্তার ধারে বাদাম গাছ। একটা ছেলে চিনাবাদাম নিয়ে বসে আছে। ভোলা যে আজ কোথায় চলে গেছে!

তেমনি একটা ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে আংটিটা আবার জায়গামতন রেখে দিয়ে নিমকি টানাটা ভিতরে ঠেলে দিল। তারপর সেখান থেকে সরে এল।

মনে মনে সে হাসল। বিরক্তও হল। বড় লোকের ঘরে ঢোকার অনেক ঝঞ্ঝাট। এমন সব জিনিস কিনা খুলে মেলে ফেলে রেখে যায়।

যেন মনে মনে সে তখনি ঠিক করল, আর এই ভদ্রলোকের ঘরে কোনোদিন সে ঢুকবে না। দু টাকা বকসিস দিলেও না।

তার চেয়ে অন্য ঘরের কেরানি বাবুরা ভাল। তাদের কিছুই নেই, কিছুই খুলে ফেলে রেখে যায় না, কাজেই সে সব ঘরে ভয়ও নেই।

দুধের মতন ধবধবে বিছানা। কত উঁচু বালিশ। শিয়রের বালিশ, পাশ বালিশ। আঙুল রাখলে আঙুল ডুবে যায় এত নরম, এত মোলায়েম।

আগে বালিশগুলি তুলে নিমকি রেলিং-এর ওপর রেখে এল। এবার সে চাদরটা সরিয়ে তোষকটা টানছিল।

একটা কোনা মুড়ে আর একটা কোনা টানতে গিয়ে নিমকি হতভম্ব।

একি ! যেন সাপ দেখে চমকে উঠে ভয় পেয়ে খাট থেকে সে প্রায় দু হাত পিছনে সরে এল।

চোখ দুটো কপালে উঠে গেল তার, হৃৎপিণ্ডের নড়াচড়া বন্ধ হবার মতন একটা অবস্থা নিয়ে তোষকের ওল্টানো কোনাটা সে দেখছিল।

তারপর এদিক ওদিক তাকাল। শূন্য নিঃশব্দ ঘর। ওদিকের জানালাটা খোলা। পার্কটা দেখা যাচ্ছে। পার্কের পাশে বাদাম গাছ। ঘুগনি নিয়ে ঘেঁাতনা বসে আছে।

এখন আর ভোলার কথা নিমকির মনে পড়ল না।

তার সমস্ত চিন্তা সব মনোযোগ ঐ বিছানার দিকে। কাজেই, সেদিকে সে আবার চোখ ফেরাল। তারপর আবার খাটের কাছে সরে গেল।

তাড়া বাঁধা নোট। বড় নোট। একশ টাকার নোট। একশ টাকার নোট নিমকি চেনে। আগে চিনত না। দেখেনি। এখানে এসে দেখেছে। মাসের পয়লা তারিখ ম্যানেজার একশ টাকার নোট নিয়ে হোটেলের মশলা পাতি তেল নুন আরো কত কী সব কিনতে মুদির দোকানে যায়।

বিছানার ওপর ঝুঁকে নিমকি নোটের তাড়াটা দেখল। একটা একটা করে গুণল। দশটা নোট। একশ টাকার দশটা নোট মোট কত টাকা হয় সেই হিসাব তার জানা নেই, অঙ্ক কষতে শেখেনি সে, তবে এটা বুঝল—অনেক টাকা এখানে। এত টাকা তোষকের তলায় ফেলে রেখেই বাবু বেরিয়ে গেছেন।

ওফ্, কী মানুষ ! তার সমস্ত শরীর সিরসির করে উঠল। যেন গায়ে কাঁটা দিল।

কিন্তু তারপর একটা সময় এল যখন সে আশ্চর্যরকম হিসেবি হয়ে উঠল।

নোটের তাড়াটা হাতে নিয়ে এক থেকে দু মিনিট সে দাঁড়িয়ে ছিল, অঙ্ক কষতে না জানলে হবে কি, ঐ অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটা সুন্দর হিসাব তার মাথায় খেলল, যা কিনা খুব বড় বড় অঙ্ক জানা লোকের মাথায়ও খেলে না।

মা এলে টাকাটা সে মার হাতে তুলে দেবে, কিন্তু তার আগে মার কাছ থেকে সে কথা নেবে, যেন এই মাসের মধ্যেই তার বিয়ে দেওয়া হয়, এখানে অনেক টাকা, কাজেই খুব ভাল পাত্র জোটানো যাবে এখন, তবে টাকাটা দেবার আগে পাকা কথা দিতে হবে মাকে—টাকার অভাবে নিমকির বিয়ে হচ্ছে না এমন কথা যেন আর ভুলেও মা উচ্চারণ না করে।

আর যদি মা বলে যে, না এই টাকায়ও মনের মতন বর জোটানো সম্ভব হবে না, মার চোখ দেখলেই তার মনের ভাব, ভিতরের মতলবটা নিমকি ধরে ফেলবে।

হুঁ, সেরকম একটা কিছু দেখলে নিমকি মার হাতে টাকাটা দেবে না, দিলে অনেক বোকামী করবে। এই ক বছরে ঐ টাকা খাঁকতি মেয়েমানুষটার হাতে কি নিমকি তার রোজগারের কম টাকা তুলে দিয়েছে! দিলে হবে কি, নিমকির বিয়ে এখনো আকাশে ঝুলছে।

যাই হোক, যদি নিমকি বোঝে যে এই টাকাটা পেলে মা তার সেই পুঁটলির মধ্যে নিয়ে ঢোকাবে, তারপর একদিন এসে মুখ শুকিয়ে বলবে সুবিধেমত পাত্র খুঁজে পাচ্ছি না, কিছুতেই নিমকি এটা হাতছাড়া করবে না, নিজের কাছে রেখে দেবে, তারপর—

তার পরের ভাবনাটা ভেবে ঠিক করতে নিমকির একটু দেরি হল, আরো এক মিনিট সে চুপ করে একভাবে খাটের পাশে

দাঁড়িয়ে রইল। কেন না, টাকাটা এখানে তার কাছে রাখা যাবে না। কারণ আজ বিকেলে না হোক কাল সকালে এই ভদ্রলোক, হোক না মস্ত বড় লোক, এক সময় টাকাটা খুঁজবেন ঠিকই, এবং তখন যদি টের পান তোষকের নিচে টাকা নেই তো সকলের আগে নিমকিকে এসে তিনি ধরবেন, কেননা চাবি নিয়ে সে-ই খালি ঘরে ঢুকেছিল।

কাল সকালেও যদি টাকার খোঁজ না করেন তো কাল বিকেলে কি পরশু, কি আরো দুদিন পরে—মোট কথা এক সময় তোষকের নিচে ফেলে রাখা টাকার কথা বাবুর মনে পড়বেই।

কাজেই এই টাকা নিয়ে চুপ করে হোটেলে বসে থাকা নিমকির পক্ষে কিছুতেই নিরাপদ হবে না।

আজ বিকেলের মধ্যে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তার মা কি আজ একবার এদিকে আসবে? মনে তো হয় না। গত শুক্রবার মাসের পয়লা গেছে। মা এসে তার মাইনের টাকা নিয়ে গেছে। এখন মাসে একবারের বেশি এদিকে আসতে চায় না। এখন আর মেয়ের ওপর টান নেই। যত টান মেয়ের টাকার ওপর।

কাজেই দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে নিমকি চিন্তা করল আজ দুপুরে সে বেলেঘাটা চলে যাবে কি না, গিয়ে মাকে একবার পরিষ্কার করে কাথাটা জিজ্ঞেস করে দেখুক, যদি বোঝে মেয়ের বিয়ে দেবার সুমতলব তার মাথায় আছে তো নিমকি টাকাটা দিয়ে আসবে, নয়তো বাণ্ডিলশুদ্ধ সব টাকা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

না কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলবে না, ভালয় ভালয় আজ বিকেলটা যদি কেটে যায়, একবার হোটেল থেকে বোরালে—বাবুদের কিছুতেই অবশ্য সন্ধ্যার এদিকে ফেরা হয় না, যাই হোক, সন্ধ্যাটা যদি ভালয় ভালয় কাটে তো রাত্রে নিমকি ভোলাকেই

কথাটা বলবে। চল্ ভোলা, দুজনে পালিয়ে যাই, এখানে এভাবে দাঁত-খিঁচুনি মুখ-খিঁচুনি খেয়ে সারা জীবন বাসনমাজা মশলা পেশার কোনো অর্থ হয় না।

ভোলা? কপালটা একটু কুঁচকে উঠল নিমকির। সুযোগ পেলে মেয়েরা তাদের মনের মতন পুরুষ বেছে নেয়। এখানে কি নিমকির বাছাই ঠিক হল।

কেন হবে না। যেন সঙ্গে সঙ্গে নিমকি নিজের মধ্যেই প্রশ্নটার উত্তর পেল, তাগড়া জোয়ান বয়স ভোলার।

তা ছাড়া খাঁটি মানুষ, সরল মানুষ। ভিতরে কূটবুদ্ধি একেবারে নেই। এমন একটি পুরুষ সঙ্গে থাকলে মেয়েদের কোনো ভয় ভাবনা থাকে নাকি, কষ্টও থাকে না!

তবে হ্যাঁ, টাকা পয়সা, সেটা পুরুষের ভাগ্য। যদি কপালে থাকে এই ভোলাই একদিন প্রচুর পয়সা উপায় করবে।

কত ভাল ভাল লোকের উপযুক্ত ছেলে দেখে মানুষ তাদের মেয়ের বিয়ে দেয়, পরে দেখা গেল ওই লোকের ছেলে মাসে দশটা টাকাও রোজগার করতে পারছে না, আবার যারা হাজার হাজার টাকা রোজগার করছে, দেখা গেল মদ খেয়ে বেশ্যাবাড়ি পড়ে থেকে সব উড়িয়ে দিচ্ছে। কাজেই ভাগ্যে সুখ না থাকলে কেউ সুখ দিতে পারে না।

পুরুষের ভাগ্য, আর মেয়েদের হল চরিত্র। কাজেই আমার ভোলাই ভাল। নিমকি নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল। তা ছাড়া এমন একটা স্বাস্থ্য ক'টা ছেলের আছে!

মার মুখে কতদিন নিমকি শুনেছে পুরুষের স্বাস্থ্য চাই। সোয়ামীর স্বাস্থ্য থাকলে মেয়েরা সব পায়।

মরদ যদি রোগা পটকা হয় তো গাড়ি বাড়ি থেকেও মেয়েরা সুখ পায় না।

তা ছাড়া নিমকি ভাবল বসে বসে আমি মনের মতন পাত্র খুঁজব, সেই সময়ই বা কোথায়। যা করতে হয় আজ রাত্রের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে মুস্কিল আছে।

হোটেলের সন্তোষবাবু ঘর থেকে টাকা চুরি গেছে জানাজানি হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কাল সকালে পুলিশ আসবে। নিমকির কোন কথাই শুনবে না। তাকে ধরে গাড়িতে তুলে সোজা লালবাজার নিয়ে যাবে।

দরকার নেই আমার এত সব হাঙ্গামায় গিয়ে। ভোর হবার আগে ভোলার হাত ধরে এখান থেকে সরে পড়ব। সঙ্গে টাকা থাকলে আবার ভাবনা। ট্রেনে চড়লেই কত জায়গায় আমরা চলে যেতে পারব। কাকটিও টের পাবে না।

এই নিয়ে নিমকি আর চিন্তা করল না। যেন অঙ্ক মিলে গেছে, কড়াক্রান্তি হিসেবে মিলে গেছে। একটা তৃপ্তি নিয়ে নোটের গোছাটা সে ব্লাউজের মধ্যে ঢোকাল।

উঁহু, তোষকটা তুলে এনে সে রোদে দিল না। যেমন ছিল তেমন রেখে দিল। বরং চাদরটা একটু টেনেটুনে দিয়ে ওপর ওপর বিছানাটা ঝেড়ে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আবার দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিল! জিজ্ঞেস করলে বলবে, তার হঠাৎ মাথা ধরেছিল, কোনোরকমে বালিশ দুটো রোদে দিয়েছে, তোষকটা আর টেনে বাইরে আনতে পারেনি, মাথা ধরেছিল বলে শরীর এত খারাপ লাগছিল—

অর্থাৎ সে দেখাবে যে তোষক সে ছোঁয়নি। তোষকের নিচে টাকা ছিল কি সাপ-ব্যাং ছিল তা সে বলতেই পারে না।

॥ আট ॥

সিঁড়ির মুখে ভোলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যেন ভোলা কোথা থেকে পড়িমরি করে ছুটে এসেছে। ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। চোখ দুটো, রেগে গেলে উত্তেজিত হলে যেমন তার চোখের চেহারা হয়, পাটনাই পেঁয়াজের মতো লাল হয়ে আছে। নিমকি থমকে দাঁড়াল।

ভোলাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কোথায় গিয়েছিলি ?'

'ওপরে।' নিমকি মুচকি হাসল।

'হাসবি না, যে কথা জিজ্ঞেস করছি—তার উত্তর দে।' ভোলা জোরে ধমক লাগাল। 'ওপরে কোন্ বাবুর ঘরে গিয়েছিলি ?'

'সন্তোষবাবুর ঘরে।' ভোলার গলার আওয়াজটা এত রুক্ষ লাগছিল। নিমকি আর হাসল না। 'বিছানাটা রোদে দিতে বলে গেল কিনা, তাই দিয়ে এলাম।' আস্তে বলল সে।

'সেতো বুঝতেই পারছি', ভোলা ভেংচি কাটার মতন চেহারা করল। 'বাবুদের বালিশ হাতাতে তোর খুব ভাল লাগে।'

—নিমকি চুপ।

'কবে থেকে ঐ মানুষটার ঘরে যাওয়া আরম্ভ করেছিস ?'

'কবে থেকে হবে কেন', নিমকি ভুরু কুঁচকাল। 'আজই প্রথম বলল, বেরোবার সময় চাবিটা রেখে গেল।'

'ওফ্, দিন দিন কতই দেখব!' যেন কপালে চাপড় মেরে আক্ষেপ করার মতন গলার সুর করল ভোলা। ঘাড় ফিরিয়ে পাশের দেওয়ালটা দেখল। দেখতে দেখতে কী যেন চিন্তা করল। তারপর কটমট করে আবার নিমকির চোখের দিকে তাকাল। 'আর কি, মস্ত বড় মানুষের

নজরে পড়ে গেছিস—এখন আর তোকে পায় কে! না কি খুশিতে আজ ওঘর থেকে সাজগোজটা একটু বেশি করে এলি। স্নো-পাউডার ঘষে মুখটা একেবারে সাদা করে ফেলেছিস, যেন বাবুর বিছানায় বসে অনেকক্ষণ ধরে চুলটুলটাও খুব করে বাঁধা হয়েছে মনে হয়।'

'সরে দাঁড়া, আমি নিচে নামব।' সিঁড়ির মুখ আগলে দাঁড়িয়েছিল ভোলা। নিমকি ভুরু কুঁচকাল। 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তোর টিট্‌কিরি শোনার সময় নেই আমার।' একটু চুপ করে নিমকি আবার বলল, 'রোজ এক কথা—কেন, আমি সাজলে তোর এত মাথার যন্ত্রণা সুরু হবার কারণ কি।'

'মাথার যন্ত্রণা? হুঁ, তা একটু হয় বৈকি—' ভোলা গম্ভীর হয়ে উত্তর করল, 'উঁহু, পোকা যখন আগুনে ঝাঁপ দিতে যায় তখন দেখতে একটু খারাপ লাগে, কষ্ট হয় পোকাটার জন্যে, তা না হলে আর যন্ত্রণা কী।'

'আমি যখন বাবুদের ঘরে ঢুকি তখন বাবুরা বেরিয়ে যায়, খালি ঘরের চাবি দিয়ে যায় আমাকে, তুই কি চোখে দেখিস না?'

'হুঁ, তা দেখি, রোজই দেখছি—তবে কিনা—' ভোলা যে এমন চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে পারে এর আগে যেন নিমকি আর শোনেনি। আবার সেই দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে ভোলা ভেংচি কাটার মতন চেহারা করে কথা বলছিল, 'এতদিন শেয়ালের ঘরে ঢুকছিলি, হুঁ কেরানি বাবুদের ঘরে, তাই অতটা চিন্তা করিনি, সেসব বাবুদের সাহস কম, ক্ষমতা কম—আজ থেকে কিনা একেবারে বাঘের ঘরে ঢুকতে আরম্ভ করলি।'

নিমকি এবার হেসে ফেলল।

'কথার ধরন ছ্যাখো। এই বাবু কি বাঘ, খুব পয়সা আছে বলে?'

'তাই তো বলছি, রাস্তা থেকেই দেখলাম আজ কিনা দোতলায়

উঠে দশ নম্বর ঘরের তালা খুলছিস—তখনই বুঝলাম এবার ছুঁড়ি ঠিক জায়গায় এসে গেছে। এতদিন তো এ ঘরে ঢুকতে দেখিনি।'

'কেন, লোকটা খারাপ?'

'মেয়েমানুষের দালালি করে, বুঝলি', একটা চোখ ছোট করে ভোলা বলল, 'এই সন্তোষবাবু মেয়েছেলের ব্যবসা করে।'

'তুই কার কাছে শুনলি?'

'আমি তোর মতন সারাদিন ঘরে বসে থাকি না, রাস্তায় বেরোই, পাঁচ রকম কথা আমার কানে আসে।'

নিমকি একটা ঢোক গিলল।

'তবে যে শুনছি ভদ্রলোক অফিসে চাকরি করে, অনেক টাকা মাইনে পায়!'

'করুক না চাকরি, পাক না অনেক টাকা মাইনে, এটা বাবুর আর একটা রোজগারের রাস্তা। বড় বড় হোটেলে বারে মেয়ে চালান দেয়। এতে অনেক পয়সা।'

'বাইরে থেকে কিন্তু বোঝা যায় না—কেমন চমৎকার ভদ্রলোক সেজে থাকে।'

'কলকাতা শহরে এমন অনেক ভদ্রলোক আছে, বাইরে থেকে কোন্ মানুষটাকে তুই চিনবি?'

কিন্তু নিমকির মুখে এতটুকু চিন্তার ছাপ পড়ল না। ভদ্রলোক যে ব্যবসাই করুক তাতে যেন তার কিছু এসে যায় না।

'আমি তো একটা চাকরাণী, হোটেলের ঝি—আমায় চালান দিয়ে করবে কী।'

'কাঁচা বয়েস, মুখটা মিষ্টি, কাজেই হোটেলের ঝিয়ের ওপরই বাবুর এখন চোখ পড়েছে।' যেন একটা তেতো ঢোক গিলছে—মুখটা এমন বিকৃত করল ভোলা। 'যাদের কাছে মেয়ে চালান দেওয়া হবে তারা দেখবে বয়সটা কচি কিনা গতরে যৌবন আছে কিনা—বাস, তবেই

তারা তুষ্ট, কে বা ঝি, কে বা লাটসাহেবের মেয়ে, সেসব তারা দেখে না।'

'ইস তোর মুখে কিছু আটকায় না রে ভোলা!'

ভোলা হঠাৎ কথা বলল না। দামী ক্রিম পাউডার মেখে এসেছে নিমকি। সিঁড়ির পথটা মিষ্টি গন্ধে ম ম করছিল। যেন তাই নাকে লাগতে ভোলা আবার কটমট করে নিমকির মুখটা দেখল।

'আমার মনে হয় তুই বাজে কথা বলছিস', নিমকি নতুন করে হাসল। 'রাস্তায় কার মুখে কী শুনেছিস, তাই ছুটে এসেছিস — আসলে আমি একটু সাজগোজ করলেই তোর মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

'করনা তুই সাজগোজ, তোকে বারণ করছে কে।' ভোলা সিঁড়ির ওপরই একদলা থুথু ফেলল। 'তোর যখন পাখা গজাতে আরম্ভ করেছে, তুই তো বলবিই এসব বাজে কথা, বানানো কথা—আসলে তুই ওই জাতের মেয়ে, ভদ্রলোক ঠিক চিনেছে। আর তুইও এতদিন পর জায়গামতন এসে পা রেখেছিস।'

'না রে, ভোলা, আমি ঠাট্টা করছিলাম', নিমকি চট করে গম্ভীর হয়ে গেল। 'সত্যি তো, কোন্ ভদ্রলোক কেমন, ওপর থেকে বোঝা যায় না। তুই যখন বলছিস, আর আমি দশ নম্বর ঘরে কোনোদিন যাব না, আজই শেষ।'

ভোলা অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

'ভালো বকসিস দেবে, অন্য বাবুরা যা দিচ্ছিল তার চারগুণ তোর হাতে গুঁজে দেবে এই ভদ্রলোক, কাজেই তুই কালও ওই ঘরে ঢুকবি, পরশুও ঢুকবি, রোজ ঢুকবি।'

'না সত্যি বলছি, আমার আর এসব কাজ ভাল লাগে না, ভেবে'ছ কি, হোটেলের চাকরিই ছেড়ে দেব— তোর সঙ্গে আমার একটা ভীষণ —ভীষণ দরকারী কথা ছিল, আয়, নিচে আয়।'

'তুই ছাড়বি এই হোটেল! মধুর গন্ধ পেয়েছিস যেখানে।' ভোলার হাত ধরতে চেয়েছিল নিমকি, ভোলা তার হাতটা সরিয়ে নিল। 'রং চং রেখে দে। ভেবেছিস এসব বললেই আমি গলে যাব। আসলে তোর ভেতর নষ্টামী ঢুকেছে—না হলে রোজ বাবুদের ঘরে ঢুকে স্নো ক্রীম ঘষে বাজারের মেয়েছেলেদের মতন মুখটা এমন সাদা করে রাখিস, তোকে দেখলে ঘেন্না হয়, তুই গায়ে হাত দিলে আমার চান করতে ইচ্ছে করে।'

দুপদাপ করে ভোলা নীচে নেমে গেল।

নিমকি ফ্যালফ্যাল করে একটু সময় চেয়ে রইল। তারপর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে সে-ও নিচে নেমে এল।

কিন্তু কথা সেটা না। ভোলা একটা সমস্যা না। রেগে গেলে সব সময়ই সে এসব বলে। ভোলাকে হাত করা যাবে।

নিমকির মাথায় অন্য চিন্তা।

ম্যানেজার কোবরেজ মশায়ের বৈঠকখানা থেকে ফিরে এসেছে। সম্ভবত চান করবে। তামাক খাচ্ছে। তেলের জন্যে হাঁকাহাঁকি করছে। ঠাকুর সামনের দিকের চৌবাচ্চায় ঝপঝপ জল ঢালছে। ভোলা ম্যানেজারের জন্য তেল নিয়ে ওপরে ছুটল। ম্যানেজারের ঘরে রেডিওটা খুলে দেওয়া হয়েছে। ভীষণ চেঁচিয়ে একটা মেয়ে গান গাইছিল।

সব দেখে শুনে নিমকির মনে হল হোটেলটা যেন পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে লোকজনে ভরে উঠল, বড় বেশি শব্দটব্দ আরম্ভ হল। একটু আগে বড় নির্জন ছিল, নীরব ছিল।

অস্বস্তি লাগছিল নিমকির। এখনো নোটের গোছাটা তার বুকের কাছে জামার নিচে রয়ে গেছে।

যেন সে ফাঁক পাচ্ছিল না, সুযোগ পাচ্ছিল না কোথাও টাকাটা লুকিয়ে রাখে। তাকে চান করতে হবে, ভাত খেতে হবে। কলতলায়

বসে কিছু বাসনকোসনও মাজাঘষা করতে হবে। রান্নাঘরে জল ঢালতে হবে। অথচ এদিকে একটু নড়াচড়া করলেই তার মনে হচ্ছে কাগজের নোটগুলো জামার নিচে বড় বেশি খচখচ শব্দ করছে। যেন শব্দটা ঠাকুরের কানে যাবে, চান করতে নিচে নামলে ম্যানেজারও শব্দটা শুনবে। ভোলা তার সামনে দিয়ে ছুটোছুটি করছে। তার সঙ্গে কথা বলছিল না, কিন্তু নিমকির যেন মনে হল ভোলা একবার তার বুকের দিকে চোখ রেখে কান খাড়া করে ধরেছিল।

অবশ্য ভোলাকে ভয় নেই। ভোলাকে একসময় সব বলতেই হবে। কিন্তু সেটা এখন হচ্ছে না, পরে অবসর সময়, যখন ভোলার মেজাজ ঠাণ্ডা থাকবে, যখন তাকে নিরিবিলি পাওয়া যাবে।

কিন্তু এখন তার ভাবনা, টাকাটা কোথায় রাখে। তুবার সে ভাঁড়ার ঘরে অর্থাৎ যেখানে শোয় ঢুকতে চেষ্টা করেছে। কেন না ওখানেই আটা তেল মশলাপাতি কি চিনির টিনের তলায় বা তাকের ওপর, যেখানে দিনের বেলায় তার বিছানাটা গুটিয়ে তুলে রাখা হয়, তার পিছন দিকে কোথাও নোটের গোছাটা লুকিয়ে রাখতে হবে।

কিন্তু ঐ যে তুবার সে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে গেছে, তার যেন মনে হয়েছে তুবারই ঠাকুর চোখটা আড় করে তাকে দেখছিল। একবার যখন ঠাকুর রান্নাঘরে চৌকাঠের কাছে বসে গায়ে তেল মাখছিল, আর একবার যখন চান করে এসে ছোট আরসিটা মুখের সামনে ধরে মাথা আঁচড়াচ্ছিল।

নিমকির মনে হচ্ছিল আরসিটা মুখের সামনে আড়াল করে ধরে রেখে ঠাকুর খুঁটিয়ে তাকেই দেখছিল।

অবশ্য এটা নিমকির নিজের দেখার ভুল হতে পারে। এও সে চিন্তা করল। কেন না অন্যদিন এসময় কতবার সে ভাঁড়ার ঘরে ঢোকে। ওখানে তার জামাকাপড় মাথার তেল গামছা চুলের ফিতা

দাঁতন সবই রয়েছে। এটা আনতে ওটা আনতে একশবার তাকে ওই একটা জায়গায় যেতে হয়।

কিন্তু আজ কেমন যেন বাধা পাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল ওখানে ঢুকলেই ঠাকুর একটা কিছু সন্দেহ করবে।

চৌবাচ্চার পাড়টা শ্যাওলা ধরে পিছল হয়ে আছে। রোজই চানের সময় নিমকি ঝাঁটা দিয়ে ঘষে খানিকটা শ্যাওলা তুলে ফেলে।

আজ নিমকি এখনই কাজটা করতে লাগল। তার মনে হল একমাত্র এই চৌবাচ্চার ধারটাই নিরিবিলি। ওদিকটায় সরে থাকলে কেউ টের পাবে না তার বুকের মধ্যে একশ টাকার দশটা নোট আছে কি নোটের খচখচ শব্দ হচ্ছে।

শ্যাওলা ঘষতে ঘষতে নিমকি দেখল ভোলা ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনেই সিমেন্টের উপর পা ছড়িয়ে গায়ে তেল মাখতে বসে গেছে, ঠাকুর যেন ম্যানেজারের জন্যে ভাত বাড়ছিল।

ওপরে ভাত পৌঁছে দিয়ে এসে ঠাকুর খেতে বসবে। রোজ যা করে। নিমকির মনে একটু আশা জাগল। অন্যদিন ঠাকুর খেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভোলা ও সে চান করে ফেলে। তারপর দুজনে একত্র বসে ভাত খায়।

আজ ঠাকুর খেয়ে উঠলেই ভোলা যখন খেতে বসবে তখন নিমকি মাথায় তেল মাখার অছিলা করে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে পড়বে। সেখানে সুবিধে মতন একটা জায়গা দেখে টাকাটা লুকিয়ে রাখবে। এইজন্যই আজ চান করতে সে দেরি করছিল। চান করার আগে ঝামা দিয়ে ঘষে কলতলার সিমেন্টের শ্যাওলা তুলছিল।

বলতে কি, দোতলার সিঁড়ির রাস্তায় ভোলার সঙ্গে কথা বলে নিচে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন একটা ভয় ধরে গেল।

যদিও দশ নম্বর ঘরের বাবুকে নিয়ে ভোলা তখন যত কথা বলছিল তার অর্ধেক কথাই নিমকির কানে ঢুকছিল না। ভদ্রলোক মেয়েছেলে

নিয়ে ব্যবসা করে কি অন্য কিছু করে জানতে মোটেই তার আগ্রহ ছিল না। সে কেবল ভাবছিল নোটের গোছাটার কথা। তুপুরে মার সঙ্গে কথা বলতে সে বেলেঘাটা চলে যাবে—মার মতিগতি তেমন দেখলে টাকাটা নিয়ে আবার তাকে হোটেলে ফিরে আসতে হবে। তারপর বিকেলের দিকে কি সন্ধ্যার পরে ভোল্যার সঙ্গে কথাবার্তা হবে।

কিন্তু এখন তার মনে হল, তুপুরে বাড়ি থেকে বেরোনটা ঠিক হবে না। বেলেঘাটা তো পাঁচ মিনিটের রাস্তা না যে হোটেল থেকে বেরিয়ে টুক করে সে ফিরে আসতে পারবে। একটা বাস ধরতে কত সময় লাগে। বাস-এ করে যাওয়া, মার সঙ্গে কথা বলা, তারপর আবার স্ট্যাণ্ডে এসে কম পক্ষে বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে বাস ধরা, তারপর হোটেলে ফেরা।

বেলা গড়িয়ে যাবে। লোকজন এসে যাবে। ম্যানেজারের ঘুম ভেঙ্গে যাবে, ঠাকুরের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। নিমকির খোঁজাখুঁজি পড়ে যাবে। কোথায় গেল, এখনো ছুঁড়ি ফিরল না। কয়লা ভাঙতে হবে, উনুন ধরাতে হবে।

একটা সন্দেহ জাগবে সকলের মনে। হুট করে আজ ও বেলেঘাটা ছুটে গেল কেন।

চিন্তাটার সঙ্গে সঙ্গে নিমকি কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়ল। না, বেলেঘাটা তার যাওয়া হবে না। যদি কোনো কারণে বিকেলের দিকে মা এসে পড়ে। কিন্তু—

নিমকির মনে হল আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়ার মতনই এটা প্রায় অসম্ভব। আগে তার মা কথায় কথায় এখানে চলে আসত। কিন্তু এখন, ঐ যে বলা হল, মাসের পয়লা তারিখে নিমকি মাইনে পায় আর সেটি আঁচলে বেঁধে নিতে পান চিবোতে চিবোতে হেলতে তুলতে এসে মোটা মেয়েমানুষটা হাজির হয়। তা না হলে ভুল করেও এখন আর এ রাস্তায় পা বাড়ায় না। মাগী এমন স্বার্থপর! কাজেই ভোলা—ভোলা ছাড়া তার গতি নেই।

॥ নয় ॥

ভোলা চান করে এসে ভাত খেতে বসতেই নিমকি টুক করে তার ছোট ঘরটায় ঢুকে পড়ল। অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটা ভাল জায়গা পেয়ে গেল।

একেবারে একটা কোনার দিকে যেখানটায় চাউলের বস্তাটস্তা রাখা হয় তার পিছনটা বেশ অন্ধকার। আর একটা সুবিধে হল, একটা খালি কাগজের বাক্স পাওয়া গেল। কবে কোন্ ঘরের বাবু নতুন চটি কিনে এনেছিল। বাক্সটা ভিতরের উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। চুলের কাঁটা ফিতা এবং আরো কিছু টুকিটাকি জিনিস রাখা যাবে মনে করে নিমকি বাক্সটা কুড়িয়ে এনে ভাঁড়ার ঘরের একটা তাকের ওপর তুলে রাখে।

কালি ঝুল লেগে বাক্সটা ময়লা হয়ে গেছে। চুলের ফিতা কাঁটা এসব কিছুই কিন্তু ওটার মধ্যে রাখা হয়নি। বাক্সটার কথা নিমকি ভুলেই গিয়েছিল। এখন সেটা সে কাজে লাগাল।

জামার ভিতর থেকে টাকার বাণ্ডিলটা বের করে বাক্সের মধ্যে রাখল। তার হাত কাঁপছিল তখন। হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করছিল। যা হোক, এবার সে চাউলের বস্তার পিছনে অন্ধকার জায়গাটায় বাক্সটা রেখে দিল।

কাজটা করার সময় সে তিনবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দরজাটা—হুট করে কেউ এসে পড়ে কিনা।

এই সময় কেউ আসবে না সে জানত ঠিকই। ম্যানেজার ওপরে ঘুমোচ্ছে, ঠাকুর খেয়ে উঠে দোতলার বারান্দায় শুতে চলে গেছে। ভোলা ভাত খাচ্ছে, তবে আর কে আসবে। তা হলেও

ভিতাটরে এক ত্রাস। কিছুতেই নিমকি ত্রাসটা দূর করতে পারছিল না।

টাকাটা চালের বস্তার পিছনে লুকিয়ে রাখার পর অবশ্য একটু শান্তি পেল সে। যেন বুকটা হালকা লাগছিল। কাগজের নোটের বাণ্ডিল। তা হলেও তার মনে হচ্ছিল জামার ভিতর এতক্ষণ সে যেন ক মণ ওজনের ভারি পাথর বয়ে বেড়াচ্ছিল।

এবার সে ধীরেসুস্থে চুল খুলে মাথায় তেল দিল। সাবান গামছা নিয়ে কলতলায় গেল।

ভোলা খেয়ে উঠে ঝপাং করে এঁটো থালাটা চৌবাচ্চার কাছে ফেলে রেখে কোনোরকমে মুখ হাত ধুয়ে সদরের দিকে চলে গেল। বোঝা গেল তার রাগ পড়েনি। কলতলায় নিমকি আছে বলে এখন বাসন ধোবে না। গালটা তেমনি ফুলে আছে। নিমকির দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত। আজ আর সে অন্যদিনের মতন বাবুদের ডাইনিং ঘরে দুটো বেঞ্চি জোড়া লাগিয়ে শোবেও না বোঝা গেল। হন হন করে কোথায় আড্ডা দিতে বেরিয়ে গেল।

নিমকি মনে মনে হাসল। ভোলার এই রাগ অভিমান তাকে ভাঙ্গাতেই হবে। পুরুষের রাগ অভিমান কী করে ভাঙ্গাতে হয়, কী করে মানুষটাকে হাতের মুঠোয় আনতে হয় তা সে শুনেছে, তার একটা দুটো কৌশলও নাকি আছে।

মা যখন মুড়ি ভাজত তখন তাদের পাড়ার দু চারটি গিন্নী মার উনুনটা ঘিরে বসে আড্ডা দিত।

নিমকি ধারে কাছেই ঘুরঘুর করত। তখন তাদের কথাবার্তা তার কানে আসত। সেদিন তার বয়স আরো কত কম ছিল। তা হলেও মা এবং ঐ সব গিন্নীদের রসের কথাবার্তা সে কিছু কিছু বুঝতে পারত, যেটুকু বুঝত না অনুমান করে নিত। হুঁ পুরুষের রাগ কী করে জল করে দিতে হয়, অভিমানী পুরুষকে কী করে বশ করতে হয়, তার সব কায়দা কৌশল।

ভোলা অবশ্য সর্বদাই নিমকির সঙ্গে রাগারাগি করে অভিমান করে। দুদিন হয়তো নিমকির সঙ্গে কথাই বলল না।

কিন্তু এতদিন নিমকি মা ও মার সখীদের মুখে শোনা কায়দা কৌশলের একটাও ভোলার ওপর প্রয়োগ করেনি। দরকার বোধ করেনি। আপনা থেকে ভোলার রাগ অভিমান ভেঙ্গেছে তো ভেঙ্গেছে। তার জন্য নিমকির তরফ থেকে কোনোরকম চেষ্টা ছিল না।

কিন্তু আজ অবস্থা অন্যরকম।

ভোলাকে না হলে তার চলবে না।

ভোলাকে বশ করতেই হবে।

এখন সে আড্ডা দিতে বেরিয়েছে, কলে জল আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে হোটেলে ফিরতেই হবে। কাজেই সবটা বিকেল পড়ে আছে নিমকির সামনে, সন্ধ্যাটা পড়ে আছে—আর যদি বিকেলটা সন্ধ্যাটা ভালয় ভালয় কাটে তো সারাটা রাতই নিমকির হাতে থেকে গেল তখন।

খুব পারবে সে যা ভেবেছে, ভোলাকে রাজী করাতে পারবেই। তা না হলে আর মেয়ে হয়ে সে জন্ম নিল কেন।

•

চান করার সময় মনটা খুব হালকা লাগছিল। কিন্তু একলা ঘরে ভাত খেতে বসে বুকের ভিতরটা যেন আবার ভার হয়ে উঠল। ভাতের গরাস গিলতে গিয়ে নিমকি তুবার কান খাড়া করে ধরল।

তার যেন মনে হল সদর দরজা দিয়ে কেউ ভিতরে ঢুকেছে। যেন জুতোর মসমস শব্দ করে কেউ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার গলার ভাত গলার কাছে আটকে গেল, নিচে নামল না। যদি ভদ্রলোক এখন ফিরে থাকেন? বলা যায় কি, মাথা ধরেছে শরীর খারাপ লাগছে কি জরুরী একটা দরকার পড়েছে —অনেক কারণেই বাবু অসময়ে হোটেলে ফিরতে পারেন। মাঝে

মাঝে একটি দুটি বাবু যে এভাবে দুপুরেই চলে না। আসেন এমন না।

ভাতের থালা থেকে হাতটা গুটিয়ে নিয়ে কাঠের মতন শক্ত হয়ে বসে রইল নিমকি। তার দুকান দিয়ে গরম ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

এভাবে মিনিট দু-তিন কাটল।

তারপর আর কোনো শব্দটব্দ তার কানে এল না। কেন না দশ নম্বর ঘরের বাবু যদি ফিরতেন, এখনি ঘরের চাবির জন্য তাকে বা ভোলাকে ডাকাডাকি করতেন। সেরকম কোনো হাঁকডাক শোনা গেল না।

কতকটা নিশ্চিন্ত হল নিমকি।

কিন্তু আর এক মুঠো ভাতও তার গলা দিয়ে সরছিল না। ভাতের থালায় জল ঢেলে সে উঠে পড়ল। তারপর এঁটো তুলে নিয়ে কলতলায় গেল।

বাসন মাজতে বসে আবার কান খাড়া করে ধরল। যেন সদরে একটা গাড়ি থামল। এই বাবু ট্যাক্সি করে সর্বদা ফেরেন। হয়তো ট্যাক্সিটা হোটেলের গেট্-এর সামনে এসে দাঁড়াল।

আবার দু মিনিট কাটল।

না, শুনতে সে ভুল করেছে। কেউ ভিতরে ঢুকল না।

অর্থাৎ এসব যে তার মনের ভ্রমের জন্য হচ্ছে, এটা সে খুব বুঝতে পারছিল।

তা বলে কিছুতেই তার মনটা কিন্তু আর হালকা হচ্ছিল না। ক্রমশ যেন ভয়টা বাড়ছিল।

কোনোরকমে বাসনটা ধুয়ে নিয়ে সে রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে এসে বসে পড়ল। দিনের বেলা সে ঘুমোয় না। তা হলেও ভাঁড়ার ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর বিছিয়ে সে শুয়ে থাকে। দু তিনটা পুরোনো সিনেমার বই এক বাবুর কাছ থেকে অনেকদিন আগে চেয়ে এনে কাছে রেখে দিয়েছিল।

দুপুরে মাদুরের ওপর শুয়ে শুয়ে সে রোজ একবার করে বইগুলি উল্টে পাল্টে ছবিটবি দেখে। সময়টা কেটে যায়। কলে জল এসে পড়ে। তখন উঠে আবার হোটেলের কাজে লেগে যায়।

আজ মাদুর বিছিয়ে শুতে তার একটুও ইচ্ছা করছিল না। ভাঁড়ার ঘরে এখন ঢুকতেই যেন তার কেমন লাগছিল। যেন বোমা-টোমা কিছু রেখে এসেছে সে ওখানে, ওদিকে গেলেই সেটা ফেটে গিয়ে গায়ে এসে পড়বে।

অর্থাৎ এখন সে ভাবতে আরম্ভ করল, এভাবে টাকাটা নিয়ে আসা ঠিক হয়নি। সে সরাতে পারবে না, ধরা পড়ে যাবে। সন্ধ্যার আগেই ধরা পড়ে যাবে।

তার সামনে আয়না ছিল না। থাকলে সে দেখতে পেত ভয়ে দুশ্চিন্তায় তার মুখটা আস্তে আস্তে কাগজের মতন সাদা হয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

জল তেষ্টা পাচ্ছিল তার।

কিন্তু উঠে গিয়ে কলসী থেকে যে জল গড়িয়ে নিয়ে খাবে সে শক্তি তার ছিল না।

একবার ভাবল, যেখান থেকে টাকাটা তুলে এনেছিল সেখানে আবার সেটা সে রেখে আসুক। দরকার নেই ঝামেলায় গিয়ে। তাকে দিয়ে এতবড় কাজ হবে না।

এখানে তো এত এত টাকার বিষয়। হোটেলে চাকরী করতে আসার আগে একদিন বেলেঘাটায় তার মার টিনের কৌটো থেকে একটা টাকা সে সরিয়ে রেখেছিল।

দুপুরে সরিয়েছিল। তার মা তখন ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু বিকেলে ঘুম থেকে উঠে কৌটোয় হাত দিয়েই যেন টের পেয়ে যায়, একটা টাকা কম হচ্ছে।

টাকা পয়সা সম্বন্ধে তার মা চিরকালই এত হুঁসিয়ার। নিজকি

মুখ শুকিয়ে বলেছিল, আমি জানি না, ওতে টাকা থাকে তা-ই আমি জানি না, এক টাকা কি করে কম হচ্ছে তা আমি কেমন করে বলব, হয়তো তুমিই কোন্ সময় খরচ করেছ, এখন আর মনে নেই।

কিন্তু এসব বলে নিমকি টাকাটা মারতে পারেনি। এমন লাফালাফি শুরু করে দিল মোটা মেয়েমানুষটা, আর গলাবাজি। রাত দশটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে মুখ চালিয়ে গেল। তখন বাধ্য হয়ে নিমকি টাকাটা ফিরিয়ে দেয়।

অবশ্য দেবার সময় সে বলেছিল, এটা তার নিজের টাকা। দু'পয়সা চার পয়সা করে জমিয়ে একটা টাকা সে করেছিল। কিন্তু সেসব কি আর ঐ মানুষ বিশ্বাস করে!

যাই হোক, নিজের মার কৌটো থেকে এক টাকা তুলে নিয়েও সে সারতে পারল না, আর এখানে তো শয়ে শয়ে টাকা, তা-ও এক ভদ্রলোকের টাকা।

তাই সে ভাবতে লাগল, তবে কি টাকাটা রেখে আসবে।

কিন্তু তখনই তার মনে পড়ল, ঠাকুর দোতলার বারান্দায় শুয়ে আছে। হয়তো এতক্ষণে ঘুম ভেঙ্গে গেছে। কলে জল আসার সময় হয়ে এল।

আর যদি ঘুম না ভেঙ্গেও থাকে, তার পায়ের শব্দে জেগে উঠতে পারে, যখন তালা খুলবে তখন হয়তো তাকে দেখে ফেলবে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের মনে সন্দেহ হবে। বিছানা ঝেড়ে বালিশ রোদে দিয়ে দরজা বন্ধ করে ছুঁড়ি নিচে চলে গেল, আবার এল কেন! এই সময় তো সে আসে না। রোজ সেই রোদ পড়ে গেলে বিছানা বালিশ তুলে রাখতে আর একবার ওপরে আসে। কিন্তু আজ এখনই তার ঐ ঘরে কী দরকার পড়ল। চিন্তা করে নিমকির হাত-পা কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল।

যা ভেবেছিল, ঝপঝপ করে কলে জল এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে

সিঁড়িতে ঠাকুরের পায়ের শব্দ শোনা গেল। লোকটা যেন ঘড়ির কাঁটা। একেবারে মাপাজোখা ঘুম, এক মিনিট এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

নিমকি হাঁটুর উপর কাপড় তুলে বসেছিল। কাপড়টা টেনে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। ম্যানেজারের গলার শব্দ শোনা গেল। ঘুম ভেঙ্গেছে। চায়ের জন্য হাঁকডাক আরম্ভ হয়েছে।

ঠাকুর নিচে এসে মুখ হাত ধুতে বাইরের কলে চলে গেল। এখনি এসে উনুনে আগুন দেবে। রান্নাঘরের দরজা ছেড়ে নিমকি এক পাশে সরে এল। এবং তখন ছুটতে ছুটতে ভোলাও এসে ভিতরে ঢুকল। নিমকির দিকে তাকাল না। সোজা ওপরে চলে গেল। বোঝা গেল, দোকান থেকে ম্যানেজারকে চা এনে দিতে হবে, পয়সা ও কেটলি আনতে ভোলা ওপরে ছুটে গেল। রোজ এই সময় ম্যানেজারকে সে বাইরে থেকে চা এনে দেয়।

কাজেই নিমকিকে এখন কাজে লাগতে হবে, কয়লা ভাঙ্গা আছে, জল তোলা আছে, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। কিন্তু আজই শেষ, কাল থেকে কেউ তাকে আর হোটেলে দেখতে পাবে না। কাল সকাল থেকে সে—

চিন্তাটা সুখের ছিল। অন্য যেকোনো সময় হলে এমন একটা চিন্তা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সে গুনগুনিয়ে গান গাইতে আরম্ভ করত, কিন্তু আজ যে এর সঙ্গে অন্য একটা ব্যাপার জড়িয়ে আছে, এবং ব্যাপারটা এতই বিশ্রী, এতই ভয়ের—

বলতে কি, তার যেন মনে হচ্ছিল, দেখতে দেখতে খানিকক্ষণ পরেই রোদ পড়ে যাবে, রেলিং-এর গায় শুকোতে দেওয়া বালিশ দুটো যে সে আবার সেই দশ নম্বর ঘরের তালা খুলে ভিতরে নিয়ে ঢোকাবে, সেই সাহসটুকুও যেন তার ছিল না। যেন এখন বালিশ রাখতে গেলেই তাকে সন্দেহ করবে। মুখটা তার কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল। এখন উপায়?

কী করবে, কী করা যায়, ভাবতে ভাবতে কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে কয়লা ভাঙ্গার জায়গায় গিয়ে সে বসল। কিন্তু কয়লা ভাঙ্গবে কি, তার হাত উঠছিল না, গায়ে এক ফোঁটা জোর পাচ্ছিল না। চোখে মুখে অন্ধকার দেখছিল।

বলা যায় কি, যেন ইচ্ছা করে নিমকি এমন একটা কাজ করল। কয়লা ভাঙ্গা প্রায় হয়ে গিয়েছিল। শেষ চাকাটা ভাঙ্গতে গিয়ে হাতুড়ির ঘা বসিয়ে বাঁ হাতের একটা আঙুল থেঁতলে ফেলল। নখটা প্রায় উঠে যাবার অবস্থা। রক্তও ঝরল কম না।

ঠাকুরের চোখে পড়ল।

'—আহা, করলি কি করলি কি! জলপটি লাগা।' ব্যস্ত হয়ে ঠাকুর নিজেই কোথা থেকে এক ফালি ন্যাকড়া যোগাড় করে এনে জলে ভিজিয়ে নিমকির আঙুলে জড়িয়ে দিল।

চা খেয়ে ম্যানেজার তখন পায়খানায় যাবে বলে নিচে এসেছিল। নিমকির আঙুলের অবস্থা দেখে ম্যানেজার ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 'ডেটল লাগা ডেটল লাগা, আমার ঘরে ডেটলের শিশি আছে, ভোলা, ছুটে গিয়ে শিশিটা নিয়ে আয়।'

ভোলা ওপর থেকে ওষুধটা নিয়ে এল। ম্যানেজার দাঁড়িয়ে থেকে নিমকির জখমের জায়গাটায় ডেটল লাগিয়ে দিল। পায়খানায় যাবার আগে বলে গেল—'এখন আর তোকে কিছু করতে হবে না। চুপ করে এক জায়গায় বসে থাক।'

নিমকি ডান হাতে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছিল। বাঁ হাতের আঙুলের ব্যথায় সে কাঁদছিল কি?

'ভোলা!' আঁচলটা এক সময় চোখ থেকে সরিয়ে নিমকি ডাকল।

'কি হয়েছে?' যেন রাগটা একটু কমেছে ভোলার। মেয়ে-

ছেলেকে কাঁদতে দেখলে কে আর রাগ নিয়ে বসে থাকে। ভোলা কাছে সরে এল।

'একটা কাজ করবি ভোলা।' যেন আঙুলের যন্ত্রণায় নিমকি ভাল করে কথা বলতে পারছিল না। 'আমি তো এই হাত নিয়ে তালা খুলতে পারব না, আমার আঁচল থেকে চাবিটা নিয়ে যা, দশ নম্বর ঘরের বাবুর বালিশ দুটো রোদে দিয়েছিলাম। তুই ঘরে রেখে আসবি।'

ভোলা চুপ করে রইল। যেন ইচ্ছে নেই। এসব কাজ করে বলেই না নিমকির ওপর তার রাগটা বেশি।

'যা না, ভূতের মতন দাঁড়িয়ে রইলি কেন?' ঠাকুর কথাটা শুনতে পেয়ে রান্নাঘর থেকে গলাটা বাড়িয়ে দিল। 'আঙুল নিয়ে বেচারা কষ্ট পাচ্ছে খুব, বালিশ দুটো রেখে আয়।'

মুখ কালো করে নিমকির আঁচল থেকে চাবি খুলে নিয়ে ভোলা ওপরে চলে গেল।

যেন একটা বিপদ কাটল। অনেকটা শান্তি পেল নিমকি। অবশ্য খুব অল্প সময়ের মত। সবটা অশান্তি তো ভাঁড়ার ঘরে চালের বস্তার পিছনে লুকোনো রয়েছে। রোদটা প্রায় নিবে গেছে।

আর কি, এবার বাবুরা এক এক করে হোটেলে ফিরবে।

দশ নম্বর ঘরের বড় চাকুরে সন্তোষবাবু একটু রাত করে ফেরে। কে জানে, ভোলা যা বলল, যদি সেরকম কিছু ব্যবসা করে তো রাত করেই ভদ্রলোকের হোটেলে ফেরার কথা।

কিন্তু কথা সেটা না, ন্যাকড়া জড়ানো আঙুলটা চিবুকের কাছে ঠেকিয়ে নিমকি ভাবছিল, অন্যদিন যেমন তেমন, আজ যে ভদ্রলোক সকাল সকাল ফিরবে না কে জানে। হয়তো বিছানার নিচে টাকাটা রেখে গেছে মনে করে এখনি ফিরে আসবে। এসে টাকাটা নিয়ে আবার বেরোতে পারে। তাঁর চিন্তা কি। ট্যাক্সি করে কাজে বেরোয়, ট্যাক্সি করে হোটেলে ফেরে। ট্রাম-বাসের জন্য ধাক্কাধাক্কি করতে

হবে ভয়ে অন্য বাবুদের মতন একবার কোনোরকমে ঘরে ফিরতে পারলে আর সারাদিনের জন্য কি সারারাতের জন্য বেরোব না, এমন ভাবনা তাঁর নেই। পয়সাওয়ালা মানুষ।

কাজেই যত অন্ধকার হচ্ছিল, নিমকির হাত-পা, এমন কি বুকের ভিতরটাও নতুন করে হিম হয়ে আসছিল।

আঙ্গুলের জন্য কোনো কাজ করতে হচ্ছিল না, ম্যানেজার ছুটি দিয়েছে। একলা ভোলাকেই সব করতে হচ্ছিল।

রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে নিমকি একভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যেন খুব মন দিয়ে ঠাকুরের রান্না দেখছিল। নিমকির চোখ দুটো সেদিকেই ছিল। কিন্তু তার কান ছিল ওপরে। বাবুরা আসতে আরম্ভ করেছে। কোন্ কোন্ ঘরের দরজার তালা খোলা হচ্ছে, যেন এখান থেকে সে টের পাচ্ছিল। হোটেলে থেকে থেকে কানটা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

॥ দশ ॥

সন্ধ্যার বিপদটা কাটল।

ঘরে ঘরে বাবুরা ফিরেছে, সেই একটি বাবু ছাড়া। নিমকি একটু আশ্বস্ত হল। অত রাত করে ফিরে এসে কি আর ভদ্রলোক টাকার খোঁজ করবে। খোঁজ করতে করতে সেই কাল সকাল। তার আগেই ভোলার সঙ্গে পরামর্শ করে নিমকি একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারে।

ওপরে বাবুরা তাসটাস খেলছিল, গল্প গুজব করছিল, রেডিওর খবর শুনছিল। অফিস কাছারী সেরে এসে রোজ যেমন করে।

কিন্তু আড্ডাটা সেদিন জমেছিল বেশি তিন নম্বর বাবুদের ঘরে।

মজা হল এই যে, নিমকি যেমন টাকা চুরি করেছিল, তেমনি রজনীবাবুও ফলাও করে রুমমেট বাসুদেব বাবুকে আর একটা চুরির গল্প শোনাচ্ছিলেন। সেই গল্প শুনতে দু নম্বর ঘরের হরিদাসবাবু এবং পাঁচ নম্বর ঘরের কানাইবাবুও অবশ্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

—তা চুরি বলতে যে সব সময় টাকাপয়সা সোনাদানা ঘড়ি পেন জামাজুতো চুরি হবে তার কোনো মানে নেই।

গল্পটা আরম্ভ করার আগে চোখ টিপে রুমমেট বাসুদেব বাবুর দিকে একবার তাকিয়ে রজনীবাবু দু নম্বর ঘরের হরিদাসবাবু এবং পাঁচ নম্বর ঘরের কানাইবাবুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অল্প অল্প হাসছিলেন।

কানাইবাবু তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করেছিলেন।

—তা তো বটেই, সংসারে অনেক রকম চুরি আছে। মেয়ে চুরি ছেলে চুরি থেকে আরম্ভ করে পুকুর চুরির অনেক দৃষ্টান্তই এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

—কিন্তু আমি আজ আপনাদের যে চুরির গল্পটা শোনাব তার চেয়ে বড় চুরি, মারাত্মক চুরি বোধ করি জগতে আর কিছু নেই।

রজনীবাবুর কথা শুনে ঘরের তিনটি মানুষ চোখ বড় করে এমন কি দমবন্ধ করে গল্পটা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

তখন রজনীবাবু হাসতে হাসতে গল্প শুরু করলেন। সদ্য অফিসে তিনি এই চুরির কাহিনী শুনে এসেছেন। অফিসের কলিগ্ নৃপেন বাবুদের পাড়ার কোন এক বনবিহারী বাবুর বাড়িতে এই সাংঘাতিক চুরিটা হয়েছিল। টিফিনের ঘণ্টায় নৃপেন বাবুর মুখে রজনীবাবু যেমনটি শুনেছিলেন হাত নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে হোটেলের বাবুদের কাছে ঘটা করে তা বর্ণনা করলেন।

হুঁ, বনবিহারীবাবু সেদিন অসময়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ভয়ানক মাথার যন্ত্রনা। অর্ধেক অফিস করে পালিয়ে এসেছেন। কিন্তু বাড়িতে ঢুকবার মুখে সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাত একটি মুখ দেখে তিনি দারুন চমকে ওঠেন। ঠিক চোরের মতন চাউনি ছেলেটার। কিছু চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছে না তো! বনবিহারী কটমট করে তাকিয়ে রইলেন। যেন সাপের চোখের মতন পিটপিট করছিল ছোঁড়ার চোখ দুটো। অবিকল সাপের মতন সুরুৎ করে গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে হনহন করে একদিকে চলে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে বনবিহারী রাস্তাটা দেখতে লাগলেন।

রোদ খাঁ-খাঁ করছে। একটা রিক্সা যাচ্ছে ঢিমে-তেতালায়। সম্ভবত সওয়ার নেই। গরুর গলার ঘণ্টার মতন ঘণ্টা বাজছে। দূরে একটা লাইটপোস্টের মাথায় একটা কাক বসে আছে। রাস্তায় একটা লোক নেই।

কাজেই চোর কোথাও বাধা পেল না।

হনহন করে হেঁটে চলে গেল।

তারপর বাঁ-দিকে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হল।

এতক্ষণ পর বনবিহারী ভাল করে শ্বাস ফেলতে পারলেন, শ্বাস টানতে পারলেন।

তবে কিনা প্রশ্ন চিহ্নের মতন তাঁর ভুরু ছুটো বেঁকে রইল।

তাই তো, সদর কে খুলে দিল।

সাড়ে নটায় তিনি বেরিয়ে যান। তারপর থেকে তো গেট্ বন্ধ থাকার কথা। তাই তো থাকে। রোজ এসে তিনি কড়া নাড়েন। ভিতর থেকে দরজা খুলে দেয়।

তবে কিনা ভুলভ্রান্তি।

ভুল সকলেরই হয়। তিনি নিজে কতদিন ভুল করে ট্রামের মান্থলি ফেলে যান, কতদিন অফিসের চাবি বাড়িতে রেখে যান। পরে আবার পিওন পাঠিয়ে চাবি চেয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

তা হলেও শহরতলীর এদিকটায় লোকজন কম। সুবিধা মতন ভাড়ায় বাড়িটা পাওয়া গেছে বলে তিনি এটা নিয়েছেন। ছুজন মানুষের এতটা জায়গার দরকার পড়ে না, তা হলেও গোটা বাড়িটা তিনি নিয়েছেন। চারদিক ঘিরে চমৎকার একটা পাঁচিল আছে। একটা গেট্ আছে। দরকার হলে ওটা বন্ধ রাখা যায়। বন্ধ তো রাখতে হবেই। আশেপাশে তেমন ঘরবাড়িও নেই যে প্রতিবেশী কাউকে ডাকলেই সাড়া পাওয়া যাবে।

কাজেই ভাড়া যতই সুবিধা হোক পাঁচিল না থাকলে তিনি কখনই এ বাড়ি নিতেন না।

কিন্তু এমন ভুল হবেই বা কেন। অফিসের মান্থলি ফেলে যাওয়া কি চাবি ফেলে যাওয়া গোছের ভুলের সঙ্গে এই ভুলের তুলনা করলে চলে না। যেখানে দিনছুপুরেও সদর খোলা পেয়ে চোর গুণ্ডা বদ্‌মায়েস ইত্যাদি যে-কোনো রকম ছুষ্ট প্রকৃতির একটা মানুষ ঢুকে পড়তে পারে—এই ভুলের পরিণাম যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে—

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বনবিহারী সদর পার হয়ে ভিতরে ঢুকলেন। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

তারপর তিনি তাঁর বসবার ঘরে ঢুকলেন।

ছাইয়ের মতন ফ্যাকাসে চেহারা করে ইন্দ্রাণী সেখানে বসে আছে। যেন সোফাটার ওপর বসে বসে কাঁদছিল। তাঁর পায়ের শব্দ শুনে স্প্রীংয়ের মতন ইন্দ্রাণী লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ইন্দ্রাণীর চোখ মুখের অবস্থা দেখে বনবিহারী ভয় পেলেন।

'কি হল! কি হয়েছে?' বিড়বিড় করে উঠলেন তিনি।

'দেখলে, লোকটাকে তুমি দেখলে!' আর্তনাদের মতন স্বর করে উঠল ইন্দ্রাণী। 'উঃ, ঈশ্বর সহায়, আজ তুমি অসময়ে এসে গেলে।'

'কে, লোকটা কে?' বনবিহারী বড় করে একটা ঢোক গিললেন। 'হু, ছোকরা মতন, হাতে ঘড়ি আছে, ছুঁচলো জুতো, সরু প্যাণ্ট, ফিনফিনে হাওয়াই সার্ট—আমাকে দেখে কেমন হকচকিয়ে গেল, তারপর ছুটে পালাল।'

'উঃ!' যেন একটা কিছু ভেবে ইন্দ্রাণী পায়ে মাথায় শিউরে উঠল। 'তিন মিনিট—তিন থেকে চার মিনিট ছিল দুষ্ট এঘরে, আমি কেবল ঈশ্বরকে ডাকছিলাম, আহা যদি এমন হয়, আজ সে একটু সকাল সকাল অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার জুতোর শব্দ শোনা গেল।'

'তারপর?' বনবিহারীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। 'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, কেন এই ছোঁড়া এসেছিল, কোথা থেকেই বা এল!'

'তুমি বসো। আমার পাশে বসো। উঃ পা দুটো কাঁপছে, দাঁড়াতে পারছি না।' ইন্দ্রাণী ধপ্ করে আবার সোফার ওপরে বসে পড়ল। 'তুমি ছাখো, এখানে হাত দিয়ে ছাখো, আমার হৃৎপিণ্ডটা এখনো কেমন লাফাচ্ছে।'

'কৈ দেখি!' বনবিহারী স্ত্রীর পাশে বসে তার বুকে হাত রাখলেন। কথা বললেন না। চোখ বুজে থেকে অশান্ত হৃৎপিণ্ডের আলোড়ন অনুভব করলেন।

'কোথা থেকে এসেছিল আমি কি করে জানব।' কান্নার মত সুর করে ইন্দ্রাণী তখন স্বামীর চোখ দুটো দেখল। 'হ্যাঁ, স্বীকার করছি, গেট বন্ধ করতে আজ ভুলে গিয়েছিলাম—তা এমন ভুল কি মানুষের হয় না, তুমিও তো কতদিন মাদুলি সঙ্গে নিয়ে বেরোতে ভুলে যাও, কতদিন ভুল করে অফিসের চাবি বাড়িতে ফেলে গেছ, মানুষেরই তো ভুল হয়।'

'একশবার, আমি তো বলছি না যে কারো কোনো দিন ভুল হতে পারবে না।' সান্ত্বনা দেবার মতন মুখের ভঙ্গি করে বনবিহারী স্ত্রীর বুক থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে তার একটা হাত মুঠোর মধ্যে টেনে নিলেন। 'তা ছাড়া বেরোবার সময় আমি সদর দরজাটা ভেজিয়ে রেখে যাই। আজও রেখে গিয়েছিলাম, এমনও হতে পারে, হঠাৎ তুমি যেন দেখলে গেট্ বন্ধ আছে—যেন তোমার মনে হল তুমিই ওটা বন্ধ করেছ—সময় সময় এমন ভ্রমও মানুষের হয়। চোখের ভুল থেকে মনের ভুল। যাক গে, গেট্ বন্ধ আছে দেখে তুমি নিশ্চয় তখন শুয়ে পড়লে?'

'তাই তো রোজ করি। তোমাকে খাইয়ে দাইয়ে বিদেয় করে দিয়ে আমিও তোমার পাতেই দুটো ভাত নিয়ে বসে পড়ি। তারপর আর আমার কাজ কি, ছটায় তুমি বাড়ি ফিরবে, তখন আবার আমার কাজের পালা সুরু। তোমাকে চা করে দেব খাবার খেতে দেব। খেতে খেতে তুমি গল্প করবে, আর আমি গল্প শোনার ফাঁকে ফাঁকে ঘর দোরটা একটু গুছিয়ে নেব, তারপর গা ধোব চুল বাঁধব। তারপর—'

'যাক গে, খেয়ে তুমি শুয়ে পড়লে—তারপর?'

'হুঁ, সদর ভেজানো দেখে হঠাৎ যেন আমার মনে হল আমিই বুঝি একসময়, রোজ যেমন করি, খিল এঁটে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে এসেছি,

কাজেই আর বেরিয়ে দেখতে এলাম না। তুমি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিলাম, তারপর শুয়ে পড়লাম।'

'তারপর?'

'হঠাৎ বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনলাম। আমার চোখ প্রায় লেগে এসেছিল। পায়ের শব্দ শুনে তন্দ্রা ছুটে গেল, চড়াক করে রক্ত লাফিয়ে মাথায় উঠে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে পড়ল, তাই তো, সদরটা তো তাহলে বন্ধ করা হয়নি, হায়, তখন কী আমার মনের অবস্থা! রীতিমত কাঁপতে আরম্ভ করলাম। একবার ভাবলাম, তোমার পায়ের শব্দ, তুমি হয়তো সকাল সকাল ফিরে এসেছ, কিন্তু আমি জানি, সদর খোলা থাকলেও বারান্দায় উঠে তুমি আমার নাম ধরে ডাকবে, যেমন রোজ ডাকো, কান পেতে রইলাম, তোমার গলা শোনা গেল না, শুনলাম অপরিচিত মানুষের গলা, বলছিল, শুনুন, একটু এদিকে আসুন। আমি শোবার ঘর থেকে বেরোলাম না, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।' আঙুল দিয়ে ইন্দ্রাণী পাশের কামরার দরজাটা দেখাল। 'ততক্ষণে এ ঘরে ঢুকে এই সোফাটার কাছে চলে এসেছে লোকটা। উঃ, যদি এই দরজাটাও আমি বন্ধ রাখতাম।' ইন্দ্রাণী আঙুল দিয়ে বনবিহারীর পিছনের দরজাটা দেখাল।

বনবিহারী মাথা নাড়লেন।

'সদর বন্ধ থাকে বলে আমাদের বসবার ঘরের দরজা খোলাই থাকে, তাই না?'

ইন্দ্রাণী থুতনি নাড়ল।

'ওটা আর বন্ধ করার দরকার হয় না, তা হলে তো দুপুরবেলা শোবার ঘরের দরজাও বন্ধ রাখতে হয়—' ইন্দ্রাণী আবার যেন একটু শিউরে উঠল। 'একে এই গরম, তার ওপর দুপুর বেলা যদি সব দরজা জানলা বন্ধ রাখতে হয়—'

'না না, সে একটা কথাই নয়।' বনবিহারী স্ত্রীর হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু

ঠেকিয়ে আর একটু ঘন হয়ে বসলেন। 'ইলেকট্রিক নেই এখানে, তাই সামান্য একটা পাখা পর্যন্ত খাটান যাচ্ছে না—'

'যাক গে, যা নেই তা নিয়ে এখন আফসোস করে লাভ নেই। আমি জানি, যেদিন ইলেকট্রিক আসবে সেদিনই তুমি পাখা আনবে। হুঁ, শোন, তারপর কী বলল লোকটা—'

'হুঁ, কী বলল?' মেরুদাঁড়া টান করে বসলেন বনবিহারী। 'চাঁদাফাদা কিছু চাইছিল কি?'

'ধেৎ!' ইন্দ্রাণী ভুরু কুঁচকালো। 'অমনি হুট করে তুমি চাঁদায় চলে গেলে। না, চাঁদা চাইল না, বলল, আপনি একটু এদিকে আসুন।'

'এদিকে আসুন মানে? তুমি তো ওই দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলে?' বনবিহারী চোখ তুলে পাশের কামরার দরজাটা দেখাল।

ইন্দ্রাণী মাথা নাড়ল।

'দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু আমি মুখ দেখতে দেইনি, শরীর দেখতে দেইনি। কপাটের আড়ালে ছিলাম।'

অল্প শব্দ করে বনবিহারী হাসলেন 'তুমি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে অন্তঃপুরচারিণী হয়ে রইলে।'

'কী করব, সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ, কেন আমি তার সামনে বেরিয়ে আসব?'

'হুঁ, তারপর কী বলছিল লোকটা?'

'বলছিল, একটু সামনে আসুন, কথা আছে।'

'আশ্চর্য!' বনবিহারী বিড়বিড় করে উঠলেন। 'মানে চাইছিল তুমি ওই দরজা পার হয়ে এখানে এঘরে চলে আস, তাই না?'

'তাছাড়া আর কি, কপাটের আড়ালে থেকে আমি তার মুখটা দেখছিলাম, আমার হৃৎপিণ্ড তখন জমে হিম হয়ে গেছে—লোকটার চোখ দেখে বুঝতে পারছিলাম, কোনো কুমতলব নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছে সে—'

'তারপর?' একটা তিক্ত ঢোক গিললেন বনবিহারী। 'তুমি তখন কী বললে?'

'আমি শক্ত হয়ে রইলাম, কপাটের আড়ালে থেকে বললাম, আপনার কী বলবার আছে বলুন, আমি শুনতে পাচ্ছি।'

'বেশ করেছিলে, খুব ভাল উত্তর দিয়েছিলে? স্কাউণ্ড্রেলটা তখন কী বলল?'

'বলল, আমি আপনার কর্তার অফিস থেকে এসেছি, আমার নাম অলক চ্যাটার্জি, ঐ অফিসে আমিও কাজ করি—'

'উঃ, কতবড় মিথ্যাবাদী, কী সাংঘাতিক জোচ্চোর?' বনবিহারী গায়ে মাথায় শিউরে উঠলেন। 'অলক বলে আমাদের অফিসে কোনো ছোঁড়া কাজ করে না, চ্যাটার্জি বলতে এক নবেন্দু চ্যাটার্জিই আছে—'

'আরে আমি তো জানি, তোমার অফিসের সব কটা নাম আমার প্রায় মুখস্ত—' স্বামীর কাঁধের সঙ্গে কাঁধ ঠেকাল ইন্দ্রাণী। 'কাজেই সঙ্গে সঙ্গে আমি আরো শক্ত হয়ে গেলাম, সাবধান হয়ে গেলাম।'

বনবিহারী মুখটা বিকৃত করে ফেললেন।

'হুঁ, তারপর কী বললে অলকবাবু, অফিস থেকে হঠাৎ এখানে ছুটে এলেন কেন?'

'হঠাৎ তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ, অসুস্থ মানে কাজ করতে করতে চেয়ার থেকে ফিট হয়ে পড়ে গেছ—তোমাকে অফিসের গাড়ি করে হসপিট্যালে নিয়ে গেছে, এখনি আমাকে অলকবাবুর সঙ্গে একটা ট্যাক্সি ডেকে হসপিট্যালে তোমাকে দেখতে যেতে হচ্ছে। তোমার বড়বাবু আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে অলকবাবুকে পাঠিয়েছেন।'

বনবিহারী নূতন করে ঘামতে আরম্ভ করলেন। চোয়াল শক্ত করে রাখলেন। ইন্দ্রাণীও ঘামছিল। শাড়ির আঁচল দিয়ে কপাল মুছল।

'তুমি তখন জিজ্ঞেস করলে না, কোন্ হাসপাতালে আমাকে নিয়ে গেছে?'

'নিশ্চয়। বা-রে, আমি কি এত বোকা, তাছাড়া আমি যে তার চোখ দেখে তার কথা বলার ধরন শুনে বুঝতে পারছিলাম, কী উদ্দেশ্য নিয়ে সে এখানে ঢুকেছে, কেন এসব আজেবাজে মিথ্যা কথাগুলো আমাকে বলছে। তবু জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ হসপিট্যালে ওঁকে নিয়ে গেছে। বলল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল।'

বনবিহারী দাঁতে দাঁত ঘষলেন। এতৎসত্ত্বেও গলার নিচে হাসলেন।

'তবু যদি মেডিকেল কলেজ বলত, নীলরতন সরকার বলত, হুঁ, পি জি হলেও কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হত—শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল, যেখানে কোনোকালে কোনোদিন আমাদের অফিস থেকে অসুস্থ অবস্থায় কাউকে নিয়ে যাওয়া হয় না।'

'আরে আমি তো জানি সব, তোমাদের অফিসের কে কবে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তারপর মানুষটাকে কোন্ হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল, সবই তোমার মুখে শোনা হয়েছে—কাজেই লোকটার কথা শুনে মনে মনে হাসলাম।'

বনবিহারী খুশি হলেন।

'ভেবেছিল মুখ্যুসুখ্যু মানুষ তুমি, পাড়া-গাঁ টাড়া-গাঁ থেকে এসেছ, তুমি যে কলকাতার মেয়ে জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করা মেয়ে হারামজাদা সে খবর জানে না। ভেবেছিল যা-হোক একটা কিছু বলে ধোঁকা দিয়ে বাজীমাৎ করবে।'

'হুঁ, আমিও অমনি ধোঁকায় পড়ে গেলাম কিনা। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, ঠিক আছে, আপনি চলে যান, আমি একাই হাসপাতালে যেতে পারব—দরকার হলে আমার মামাতো ভাইকে গড়পাড় থেকে ডেকে নিয়ে তার সঙ্গে চলে যাব।'

বনবিহারী সব ক'টা দাঁত বার করে হাসলেন।

'হি-হি, গড়পাড়, মামাতো ভাই, বেশ বলেছ, তুই যেমন ঠোকা

দিতে জানিস তেমনি তেমনি তোকেও ঠোকা দেওয়ার মতন মেয়ে আছে সংসারে—শুনে কী বলল অলক চ্যাটার্জি ?'

'একটু কেমন থতমত খেয়ে গেল। তারপর, দুষ্ট তো, বলল, আবার সেই গড়পাড় যাবেন, এখান থেকে কম দূর নয়, গড়পাড় হয়ে হাসপাতালে যেতে গেলে আপনার দেরি হয়ে যাবে, বড়বাবু তাড়াহুড়ো করে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন যাতে এখান থেকে ট্যাক্সি ডেকে চট করে আপনাকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যাই।'

'বেহদ্দ পাজি, যাকে বলে হাড় বদমাস. তুমি তখন কি বললে ?' বনবিহারী ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন।

'বললাম, সে আমি দেখব, আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কাজেই আপনার বড়বাবুর চেয়ে, আপনার চেয়ে তাঁকে দেখতে যাওয়ার গরজটা আমার বেশি—আপনার সঙ্গে যেতে আপত্তি আছে বলেই আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি নে, আপনি চলে যান।'

'খুব হয়েছে, মুখের মতন জবাব হয়েছে, যেমন কুকুর তেমন মুগুর, এ কথার পর নিশ্চয়ই মুখ ভোঁতা করে হারামজাদা এখান থেকে বেরিয়ে গেল ?'

'উহুঁ, এত সহজে কি বেরোতে চায়, খারাপ মতলব নিয়ে যে এসেছে, সদর খোলা পেয়ে বৈঠকখানা খোলা পেয়ে বদ উদ্দেশ্য নিয়ে যে সরাসরি ভেতরে ঢুকল তাকে কি এত সহজে তাড়ানো যায়, বলল, বেশ তাই হবে, আপনি কাপড় চোপড় পরে বেরিয়ে আসুন, আপনাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আমি আমার দায়িত্ব শেষ করি, তারপর আপনি গড়পাড় হয়ে আপনার মামাতো ভাইকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে যান কি একা একাই স্বামীকে দেখতে যান সেটা আপনি বুঝবেন।'

'মানে চটে গিয়ে ফোঁড়ন কাটছিল, চিকন কাটছিল শূয়র, তোমার পায়ের চটিটা তার মুখে ছুঁড়ে মারলে না কেন তখন।'

ইন্দ্রাণী হঠাৎ কথা বলল না।

'মানে তার মতলব ছিল, শোবার ঘর থেকে তুমি বেরিয়ে এ ঘরে আসামাত্র তোমার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে হোক কি তোমাকে আঘাত করে হোক, গলার হারটা হাতের চুড়িগুলো ছিনিয়ে নেওয়া, তারপর হয়তো চাবিটাবি চেয়ে নিয়ে আমাদের আরো সর্বনাশ করার ইচ্ছে ছিল।'

ইন্দ্রাণী সজোরে মাথা নাড়ল।

'না মশাই, আমার গায়ের গয়না কি আমাদের ঘরের মূল্যবান কিছু লুট করে নিতে অলকবাবুটি যে বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন একথা আমি বিশ্বাস করব না। তার অন্য ইচ্ছে ছিল, অন্য লোভ ছিল।'

বনবিহারী অন্যদিকে তাকালেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী কথা বন্ধ করল না।

'তার চোখ দেখে এক সেকেণ্ডের মধ্যে বুঝে গিয়েছিলাম কী ক্ষুধা নিয়ে সে জ্বলছিল, কোন আগুন তাকে পুড়িয়ে মারছিল।'

বনবিহারী একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ফেললেন। একটা ঢোক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিলেন। 'তোমার অনুমান হয়তো মিথ্যা না, আজকাল রাস্তায় ঘাটে পার্কে ময়দানে অলিতে গলিতে ট্রামে বাসে এদের দেখা যায়, এই আধুনিক প্রেমিকদের। চোঙা প্যাণ্ট পরে হাওয়াই সার্ট গায়ে চড়িয়ে হাতে হাত ঘড়ি লাগিয়ে সারাদিন টইটই করছে, আর মেয়েছেলে দেখলেই কী করে তার সর্বনাশটি করবে—' বনবিহারীর কথা শেষ হল না।

ইন্দ্রাণী মুখ বেঁকাল।

'আহা, ঐ তো চেহারা, ঐ তো শরীর, তার চেয়ে একটা বানরের সঙ্গে আমি প্রেম করতে রাজী, আমাদের পাড়ার নিধুধোবার গাধাটার সঙ্গে প্রেম করেও বুঝি এর চেয়ে অনেক বেশি সুখ।'

বনবিহারী চোখ বুজে হাসলেন।

'তারপর তুমি কী বললে? কাপড় চোপড় পরে তোমায় বেরিয়ে আসতে বলল, ট্যাক্সিতে তুলে দেবে বলল, তুমি তখন কী করলে শুনি?'

'কিছুই করিনি। যেমন দাঁড়িয়েছিলাম দাঁড়িয়ে রইলাম। কটমট করে সে কেবল ঐ দরজাটা দেখছিল।'

'মানে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ার ফিকিরে ছিল, আগে কথা বলে দেখল জমি নরম কি শক্ত, সেই বুঝে কোদাল চালাও, হয়তো জোর করে ওঘরে ঢুকে পড়তে পায়তাড়া কষছিল হারামজাদা।'

'আজ্ঞে না স্যার, আমিও সেভাবে তৈরী ছিলাম। পাল্লা দুটো ধরে রেখেছিলাম, তেমন মতলব দেখলে তার মুখের ওপর দরজাটা ঠাস করে বন্ধ করে দিতাম।'

'আমি তো জানি, ভয়ানক শক্ত ধাতের মেয়ে, সহজে নার্ভাস হবার পাত্রী নও তুমি।'

'আর একটু অপেক্ষা করার পর আমি বললাম, আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন, না কি চিৎকার করে লোক ডাকতে হবে।'

'বললে একথা!' বনবিহারী চোখ বড় করলেন। 'তবে তো তুমি প্রকারান্তরে তাকে বুঝিয়েই দিলে, তার কথা তুমি বিশ্বাস করছ না, তার ছেদো কথায় কান দিয়ে তুমি এতটুকু বিচলিত হওনি।'

'আমার গলার স্বর শুনেই সে বুঝতে পেরেছিল তার চালাকি ধরে ফেলেছি, তার মতলব আমি বেশ ভাল করে টের পেয়ে গেছি।'

'কিন্তু সে হয়তো এটা খুব বুঝতে পারছিল, ধারে কাছে আর তেমন বাড়িঘর নেই, নির্জন জায়গা, তুমি চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না, ছুটে আসবে না।'

'না পাক, না থাকুক আশেপাশে বাড়িঘর—এ সময় একথা বলতে হয়, সব মেয়েই বলে, তাই আমিও বললাম, আর এদিকে কপাট দুটোও এমনভাবে ধরে রাখলাম যেন আমার দিকে ও এগোচ্ছে টের পাওয়া মাত্র দরজাটা দরাম করে বন্ধ করে দিতে পারি।'

'হুঁ, সে আমি বুঝি। চিৎকার করে লোকজন ডাকছি, তার মানে লম্পটকে বুঝিয়ে দেওয়া এয়োস্ত্রী হয়ে সতী নারী হয়ে তোর কদর্য

লোভ, তোর কামকুটিল ইচ্ছা আমি কতখানি ঘৃণার চোখে দেখছি। তারপর? কথাটা বলার পর বদমাশটা কী করল?'

'ঠিক তখনই গেট-এর কাছে তোমার পায়ের শব্দ শোনা গেল, ওদিকের দরজাও খোলা ছিল, হয়তো ঘাড় ফিরিয়ে তোমাকে দেখতেও পেল, বাস তখন আর কি, ঘাড় গুঁজে সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল।

'মানে তখন সাপের মাথায় ধুলো পড়ল।' বনবিহারী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হালকা ঝরঝরে হয়ে গেল তাঁর দেহমন। অফিসের জামা কাপড় ছেড়ে আটপৌরে পোষাক পরলেন। স্টোভ জ্বেলে ইন্দ্রাণী চা করতে বসল। বনবিহারী আবার সোফার ওপর পা ছড়িয়ে বসলেন। 'যাক গে, সব শুনে এখন যেন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। এমন একটা চেহারা হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে দেখেই আমার মাথাটা ঘুরে গেল, ভাবলাম, না জানি কী সর্বনাশ হয়ে গেল, না জানি কী ভীষণ অবস্থা ভেতরে গিয়ে দেখব।' একটু থেমে থেকে আবার বললেন, 'ঐ তুমি যা বলেছ, ঈশ্বর আছেন, না হলে হঠাৎ আজ আমার মাথার যন্ত্রণা হবে কেন, সকাল সকাল অফিস থেকে চলে আসব কেন।'

'এখন কেমন আছ, এখন আর যন্ত্রণা আছে মাথায়?' ইন্দ্রাণী স্টোভ থেকে চোখ তুলল। 'টেবলেটটা খেয়ে ফেল, প্রেসার বাড়লেই তো তোমার যন্ত্রণাটা হয়।'

'তা খেয়েছি।' বনবিহারী মৃদু হাসলেন। 'ওটা তো সঙ্গেই থাকে, অফিসে থাকতে থাকতেই খেয়েছি।' একটু থেমে থেকে বললেন, 'হুঁ, আমার যন্ত্রণাটা এখন একেবারে নেই, তা ওটা যে টেবলেটের ক্রিয়া, আমি কিন্তু বলব না। টেবলেট খেয়ে একটু আরাম পাওয়া যায়, কিন্তু একেবারে যন্ত্রণা কমেনি কখনো।'

'তবে আজ কি করে যন্ত্রণা কমল!' ইন্দ্রাণী চকিত হয়ে স্বামীর মুখ দেখল।

'শক্ থেরাপি।' বনবিহারী শরীর নাচিয়ে হেসে উঠলেন। 'গেট্-এর কাছে স্কাউণ্ড্রেলটাকে দেখেই বুকের ভেতর এমন একটা ধাক্কা লাগল, মাথাটা বন্ করে উঠল—তারপর আর শরীরের কোথায় যন্ত্রণা থাকে?'

এবার ইন্দ্রাণীও হাসল। বনবিহারীর সামনে চা ও খাবার সাজিয়ে দিল। বনবিহারী খাচ্ছিলেন, গল্প করছিলেন। ইন্দ্রাণী ঘর গুছোচ্ছিল।

'শোন একটা কথা আছে।' ইন্দ্রাণী এদিকে তাকাল।

'বলো, বনবিহারী চায়ের কাপ থেকে মুখ তুললেন।

'কাল একটু দিদির বাসায় যাবার ইচ্ছে আছে আমার।'

'বেশ তো, যাবে, অনেকদিন যাওয়া হয় নি। কখন যাচ্ছ?'

'দুপুরে। তুমি বেরিয়ে যাবে—আমিও খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে পড়ব। অবশ্যি তুমি অফিস থেকে ফেরার আগেই আমিও বাড়ি ফিরে আসব।'

'কেন, এতদিন পর যাচ্ছ, না হয় একটু সময় ওখানে থাকলে, আমার অফিস থেকে ফেরার আগেই যে তোমায় ফিরতে হবে তার কি আছে। তা ছাড়া বেহালা তো এখানে থেকে দূর কম হবে না। ছুটে যাচ্ছ, আবার তখুনি ছুটে চলে আসছ—তোমার কষ্ট হবে।'

'কিচ্ছু কষ্ট হবে না। এসে তোমাকে চা করে দিতে হবে না? খাবার করে দিতে হবে না বুঝি?' ইন্দ্রাণী ভ্রূভঙ্গি করে হাসল।

'না তাতে কিছু অসুবিধে হত না—চা—খাবার, সে তো রোজই তোমার হাতে খাই। একদিন না হয় বাইরে দোকানে টোকানে—'

'কেন তুমি দোকানে চা খেতে যাবে!' ইন্দ্রাণীর গলায় হঠাৎ অভিমান জাগল। 'আমি বেঁচে থাকতে কখনো তা হতে দেব না—দিদিকে দেখে আমি আমার সময় মতন ঘরে ফিরে আসব।'

বনবিহারী মনে মনে খুশিই হলেন। কাজেই আর আপত্তি করলেন না।

'এদিকের কী ব্যবস্থা করে যাবে?' একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

'এদিকের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। গেট্-এ ডবল তালা ঝুলিয়ে যাব—আর ভেতরের দরজা জানালা তো সব বন্ধ থাকবেই।'

'হুঁ, সেই ভাল, ছোট বড় দুটো তালা লাগিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে যাবে, জায়গাটা ভাল না, কত রকম বাজে লোক—'বনবিহারীর কথা শেষ হল না।

ইন্দ্রাণী মাথা ঝাঁকাল।

'তোমাকে ভাবতে হবে না, আমার যথেষ্ট খেয়াল আছে, দুপুরে একলা বাড়িতে থাকি, আমাকে যে কত হুঁশিয়ার থাকতে হয়—'

পরিতৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাস ফেলে বনবিহারী স্ত্রীকে দেখছিলেন। কথা বলতে পারলেন না কতক্ষণ।

পরদিন বনবিহারী স্নানাহার সেরে যথারীতি অফিসে চলে গেলেন। ইন্দ্রাণীও বেরোবে। সকাল থেকে তার উদ্যোগ চলছিল। ভাল শাড়ি ব্লাউজ বের করে রাখা হয়েছে। প্রচুর গন্ধ তেল মাথায় ঘষে সাবান মেখে ইন্দ্রাণী স্নান করেছে, পরে ঘটা করে চুল বেঁধেছে, চোখে ঘন করে কাজল বুলিয়েছে। এসব তো প্রায় চোখের ওপর দেখে গেলেন বনবিহারী।

কিন্তু কখন বেরোলো ইন্দ্রাণী! যেন বেহালায় দিদিকে দেখতে যাবে বলে সে খেয়েদেয়ে কাপড় চোপড় পরে তৈরী হয়ে রইল না, তাকে কেউ দেখতে আসবে বলে জানালার গরাদ ধরে অধীর

আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তারপর সেই মানুষ এল। সেই চোর।

‘এখনো বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে।’ যুবক ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখছিল। ‘কাল প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলাম।’

ইন্দ্রাণী হেসে তাকে অভয় দিল।

‘কাল হঠাৎ শরীর খারাপ হল বলে অফিস থেকে চলে এল। আজ আর আসবে না।’

‘যদি আসে?’ যুবক প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিলল।

ইন্দ্রাণী মাথা নাড়ল।

উঁহু, আজ আমি দরজায় তালা ঝুলিয়ে বেহালায় চলে গেছি, দিদিকে দেখতে গেছি। ফিরব সেই বেলা চারটেয়।’ বলে খিলখিল করে সে হাসছিল।

‘ও, তাই বলে রেখেছ বুঝি কর্তাকে?’ যুবক প্রশ্ন করল।

ইন্দ্রাণী শুধু ঘাড়টা কাত করল।

‘কিন্তু কাল কী বলে দোষ কাটিয়েছিলে?’ যুবক আর একটা ঢোক গিলল।

‘সে তোমাকে ভাবতে হবে না, যা বলার আমি বলেছি, জান তো প্রেমে পড়লে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে, চোখ খোলে—এসো, ভেতরে এসো।’ ইন্দ্রাণী তার হাত ধরে শোবার ঘরে ঢুকল।

‘কিন্তু কে জানি বলেছিল, প্রেমে পড়লে মানুষ বোকা হয়ে যায়, চোখ অন্ধ হয়ে যায়, কিছুই ভাল দেখতে পায় না?’

‘দেখতে পায় না বোকা হয়ে যায়, এমন সব প্রেমিকই বাড়ির কর্তার হাতে ধরা পড়ে গিয়ে মার খায়, এমন সব প্রেমিকাই স্বামীর চোখের বিষ হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।’ বলে হাসতে হাসতে ইন্দ্রাণী বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। যুবক নিশ্চিন্ত হয়ে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে তার পাশে বসল।

গল্প শুনে বাসুদেববাবু হরিদাসবাবু এবং কানাইবাবুও কম হাসেননি। এমন মজার চুরির গল্প—যাকে বলে জলজ্যান্ত বিশ্বাস চুরির ঘটনা অনেকদিন তাঁরা শোনেন নি।

গল্প শেষ হতে কানাইবাবু তাঁর দামী সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে আদর করে রজনীবাবুর হাতে তুলে দিলেন। বাকী তিনজনও সিগারেট ধরালেন। সিগারেট শেষ করে হৈ-হৈ করে সব নীচে নেমে খাবার ঘরে ভিড় করলেন।

॥ এগার ॥

আজ ভোলাই বাবুদের জল দিচ্ছে নুন লঙ্কা দিচ্ছে—নিমকি কোথায় নিমকি কোথায়—সব বাবুর মুখে এক প্রশ্ন। নিমকির শরীর খারাপ, কয়লা ভাঙতে গিয়ে আঙুলে চোট লেগেছে। ঠাকুরের কাছে কথাটা শুনে সকলেই আঃ উঃ করে উঠল। তারপর চুপ করে গেল।

যেন নিমকি কাছে নেই বলে খাবার ঘরের আড্ডাটাই তেমন জমল না।

নিমকি তখন তার শোবার জায়গায় অর্থাৎ ভাঁড়ার ঘরে। মাটিতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে আছে। ইচ্ছা করে আলোটা জ্বালেনি। সে অপেক্ষা করছিল ভোলার কখন অবসর হবে।

খেয়ে উঠে বাবুরা চটি খড়মের শব্দ করে এক এক করে ওপরে উঠে গেল। নিচেটা নীরব হয়ে গেল। টেবিলের এঁটো পরিষ্কার করে ভোলা কলতলার বাসনের ডাঁই নিয়ে বসেছে। নটার জল এসেছে কলে। জলের ছপছপ শব্দ হচ্ছিল। শব্দটা নিমকির কানে আসছিল।

একটা কল হোটেলের এই অন্দর মহলে, আর একটা কল সদরের দিকে। কোনো ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল কি! সেই শব্দ!

আরো কিছুক্ষণ কাটল।

যেন ওপরের ম্যানেজারের খাওয়া হয়ে গেল। আঁচানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এবার বুঝি ঠাকুর দশ নম্বর ঘরের বাবুর ভাত নিয়ে ওপরে যাবে। রাত হয়ে গেলে ঠাকুর তাই করে। বাবুদের টেবিলে ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে আসে।

কিন্তু চাবি? দশ নম্বর ঘরে যে তালা।

তাহলে ঠাকুর এখনি নিমকির কাছে চাবি চাইতে আসবে।' নিমকি উঠে বসল। বুকের আঁচলটা ঠিক করল। তারপর হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালল।

কিন্তু আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতর ধ্বক্ করে উঠল।

যেন আলোটা লাফিয়ে চালের বস্তার পিছনে ছুটে গিয়ে অন্ধকার আড়ালটা নষ্ট করে দিল। ওই যেন জুতোর বাক্সটা দেখা যাচ্ছে। ভয়ে নিমকি তক্ষণি আলো নিবিয়ে দিল। দরকার নেই তার এ ঘরে থেকে এখন।

নিমকি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

ভঁাড়ার ঘরের কাছেই সে থাকল না।

কলতলায় চলে এল।

'ইস্, তোর খুব কষ্ট হচ্ছে আজ, তাই-না ভোলা?'

'না, কষ্ট আর কী, তোর আঙ্গুল থেঁতলে গেছে, হাতে জল লাগানো ঠিক না।'

শুনে নিমকি খুশি হল। ভোলার মেজাজটা এখন খুবই ভাল।

'কাল আঙ্গুল ঠিক হয়ে যাবে।' যেন ভোলাকে আর একটু খুশি করতে নিমকি বলল, 'কাল আর তোকে আমি একলা সব বাসন মাজতে দেব না।'

'সে দেখা যাবে।' ভোলা এবার এদিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকাল। 'তুই উঠে এলি কেন, শরীর খারাপ, শুয়ে থাকলে পারতিস।'

আহ্লাদে নিমকি প্রায় গলে গেল। একটু চোখের জল ফেলাতে কাজ হয়েছে। পুরুষকে বশ করার এটাও একটা কৌশল, মার সঙ্গে আড্ডা দিতে এসে পাড়ার গিন্নিরা এই সব বলাবলি করত।

'এখন আর তেমন খারাপ লাগছে না। আমার আঙ্গুলের ব্যথাটা একদম কমে গেছে।' নিমকি চৌবাচ্চার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। 'বাবুদের খাওয়া হয়ে গেছে?'

'ঐ তো, একজন খেতে গেল। দশ নম্বর ঘরের বড় মানুষটা এখনো ফেরেনি।'

নিমকি চুপ করে গেল। তাই বলো, ভুল শুনেছে সে, মনে মনে বলল, ট্যাক্সি না, অন্য কোনো গাড়িটাড়ি সদরের কাছে দাঁড়িয়েছিল। ভদ্রলোক এখনো ফেরেনি। তা হলে এতক্ষণে ঘরের চাবির খোঁজ পড়ে যেত।

'ঠাকুর কোথায়?' নিমকি আস্তে শুধালো।

'রাস্তায় গেছে বোধহয়।' ধোয়া থালা গেলাসগুলি একত্র করে ভোলা উঠে দাঁড়াল। 'আয়, ভাঁড়ার ঘরের আলো জ্বেলে দে।'

নিমকির বুক কাঁপছিল। কিন্তু তা হলেও তাকে আলোটা জ্বালতে হবে। তা না হলে ভোলা বাসন রাখবে কেমন করে। চাল ডাল মশলাপাতির মতন বাসনকোসনও যে ঐ ভাঁড়ার ঘরে থাকে।

নিমকি আগে ভিতরে ঢুকে আলোটা জ্বালল। কিন্তু এমন একটা জায়গায় কায়দা করে দাঁড়াল, চালের বস্তাটা তার পিছনে পড়ল, কাজেই তার শরীর ডিঙ্গিয়ে আলোটা আর সেখান অবধি গেল না, জায়গাটা অন্ধকার থেকে গেল।

ভোলা কিন্তু ভুল করেও সেদিকে তাকাল না। কাজেই নিমকির আর এতটুকু দুশ্চিন্তা রইল না। বাসনগুলি এদিকে একটা তাকের ওপর রেখে ভোলা চৌকাঠের বাইরে যেতেই নিমকি আবার আলোটা নিবিয়ে দিল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে ভোলার কাছে এসে দাঁড়াল।

'ঘর অন্ধকার রাখছিস কেন?'

'ভীষণ পোকার উৎপাত আরম্ভ হয়েছে রে ভোলা।'

ভোলা তাই বিশ্বাস করল। সরল মানুষ।

'কাল বাদলা হয়ে গেছে কিনা—' ভোলা অল্প হাসল। 'চালের গন্ধ পেয়ে সব পোকা আজ বেরিয়ে এসেছে।'

'তাই হবে।' যেন আহ্লাদে ডগমগ হয়ে এখনি ভোলার হাতটা ধরতে চাইছিল নিমকি। হনহন করে ঠাকুর ছুটে এল। মুখে বিড়ি জ্বলছে।

'ঘর খুলে দে, ঘর খুলে দে, সন্তোষবাবু এসে গেছেন।' কিন্তু ঘর খুলতে ভোলাকেই যে চাবি নিয়ে আবার ওপরে যেতে হবে। থেঁতলানো আঙ্গুল নিয়ে নিমকি এতগুলো সিঁড়ি ভাঙ্গতে পারবে না মনে পড়তে ঠাকুর ভোলার দিকে চোখ রাখল। 'যা ভোলা, ঘরটা খুলে দিয়ে আয়, বাবুর ভাত রেখে আসি – কত রাত হয়ে গেল!' গজগজ করতে করতে ঠাকুর রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

এতক্ষণ নিমকি কাঠ হয়ে গিয়ে কান খাড়া করে শুনছিল। সদরে ট্যাক্সি দাঁড়ানোর শব্দ। গাড়ির দরজা খোলার শব্দ। তার এক মিনিট পরেই দোতলার সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। তার হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে লাফাচ্ছিল।

'দে, চাবি দে।' ভোলা হাত বাড়াল।

আঁচলশুদ্ধ চাবিটা ভোলার দিকে বাড়িয়ে দিল নিমকি। যেন তার গায়ে জোর নেই। সেখানেই বসে পড়বে। আঁচল থেকে চাবি খুলে নিয়ে ভোলা ওপরে ছুটে গেল। রান্নাঘরের দেওয়ালটা ধরে নিমকি কোনমতে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর একটু সময় কাটল, আধঘণ্টা, আরো বেশি, প্রায় এক ঘণ্টা বলা যায়, যেন নিমকির শ্বাস প্রশ্বাস বইছিল না। হৃৎপিণ্ডটা নড়ছিল না। যেন চাপ ধরে সেটা একভাবে স্থির হয়ে রইল।

ঐ অবস্থায় দু-কান খাড়া করে রেখে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় দেওয়ালে পিঠ রেখে এক দুই করে সে মিনিট গুনছিল।

জামা কাপড় ছেড়ে ভদ্রলোক পায়খানায় গেলেন। পায়খানা থেকে এসে মুখ হাত ধুলেন। এবার একটু বিশ্রাম করবেন কি।

কাটল আর একটু সময়। যেন এবার তিনি খেতে বসেছেন।

আরো কিছু সময় কাটল। তারপর আঁচানোর শব্দ। মুখ মুছে সিগারেট ধরিয়ে এবার দোতলার বারান্দায় মিনিট চার পাঁচ বুঝি পায়চারি করবেন।

প্রত্যেকটা শব্দ নিমকি নিচে থেকে শুনতে পাচ্ছিল। যেন ছবিটাও সে দেখছিল। পায়চারি শেষ করে বাবু ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের টানা খুললেন কি? সেরকম একটা শব্দ নিমকির কানে এল।

কিন্তু টেবিলের টানা নিয়ে নিমকির মোটেই দুর্ভাবনা ছিল না। কেন না আংটিটা যেমন ছিল সে রেখে এসেছে। তারপর?

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ওপরটা চুপচাপ। অন্য ঘরের বাবুরা শুয়ে পড়েছে বোঝা যাচ্ছিল।

কিন্তু তিনি এখন কী করছেন? ঘাড়টা বাড়িয়ে ওপরের দিকে একবার তাকিয়ে নিমকি দেখল, এখনো ও ঘরে আলো জ্বলছে। হয়তো চিঠিটিঠি লিখছেন। নয়তো বইটই পড়ছেন। টেবিলে চকচকে মলাটের কখানা বইও নিমকি তখন দেখেছিল।

কাজেই বিপদ কাটছিল না। দরদর করে নিমকি ঘামছিল। চিঠি লেখা বা বই পড়া শেষ করে ভদ্রলোক শুতে যাবেন। শোবার আগে মশারী টাঙ্গাবেন। তোষকটা টেনেটুনে ঠিক করবেন। মশারীর ধারগুলো গুঁজে দেবেন। সেটাই সবচেয়ে সাংঘাতিক সময়।

যেন একবার নিমকির ইচ্ছা হল এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। এখনো সদরের গেট বন্ধ হয়নি। পালিয়ে গেলে তাকে আর পায় কে। থাকুক টাকার বাণ্ডিল ভাঁড়ার ঘরে পড়ে। ভোলাকেও যে শেষ

পর্যন্ত রাজী করানো যাবে তার ঠিক কি। তার চেয়ে এই মুহূর্তে এখান থেকে একলাই তার সরে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কথাটা সে ভাবল, কিন্তু কাজটা করতে পারল কি। কেননা তখনই তার মনে হয়েছে, দারোয়ান গেট-এর কাছে বসে আছে। এতরাত্রে হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলেই দারোয়ান তাকে সন্দেহ করবে, একথা সেকথা জিজ্ঞেস করবে, ম্যানেজারকে ডাকবে।

তার অর্থ, ধরা পড়ার আগেই নিমকির নিজের থেকে ধরা দেওয়ার মতন ব্যাপারটা দাঁড়াবে।

কাজেই দেয়ালে পিঠ রেখে কাঠের মতন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে ঘামতে লাগল।

ঠাকুর খেয়ে উঠে ঢেকুর তুলতে তুলতে ওপরে শুতে চলে গেল।

ম্যানেজার শুয়ে পড়েছে। দারোয়ান গেট্ বন্ধ করছে। ভোলা এসে সামনে দাঁড়াল।

'কি হল, দাঁড়িয়ে আছিস কেন, খেয়ে নে।'

'তুই ?' এতক্ষণ পর নিমকি যেন একটু শ্বাস ফেলতে পারল। 'তোর খাওয়া হয়েছে ?'

'আমিও এখন খাব।'

'বাবুরা সব শুয়ে পড়েছে ?'

'সব সব। দেখছিস না ওপরটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে।'

ভয়ে ভয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে নিমকি চোখ তুলে আর একবার দোতলার ঘরগুলি দেখল। ভোলার কথাই ঠিক। এক ফোঁটা আলো নেই কোথাও। দশ নম্বর ঘরের বাবুও শুয়ে পড়েছে। নিমকি এবার বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। তার চাপ ধরা হৃৎপিণ্ডটায় নড়াচড়া আরম্ভ হল। যেন এতবড় একটা পাথর তার বুক থেকে নেমে গেল।

'আয় দুজনে এক সঙ্গে বসে খাই।' ভোলার হাত ধরল নিমকি। ভোলা আপত্তি করল না।

॥ বার ॥

খাওয়ার সময় নিমকি কথাটা তুলল না। সাহস পেল না। তার যেন মনে হচ্ছিল বাড়ির কেউ না কেউ তখনো জেগে আছে। খুব আস্তে কথাটা বললেও কারো না কারো কানে যাবে।

তাই সে অপেক্ষা করছিল। রাত আরো গভীর হোক। কেননা তখনো বাইরে রাস্তায় গাড়িঘোড়া চলছিল, লোকজন চলাফেরা করছিল।

তার যেন সন্দেহ হচ্ছিল, হোটেলের পিছন দিকে এই একতলার ঘরে খেতে বসে খুব নিচু গলায় কথা বললেও, হোটেলের কেউ না শুনুক, রাস্তার কোনো না কোনো মানুষ শুনে ফেলবে। তৃতীয় ব্যক্তির কানে কথাটা যাওয়ার অর্থ, এমন সাঙ্ঘাতিক গোপন কথাটা পৃথিবীর সব মানুষের কানে যাওয়া।

তখন তারা এই জিনিস চেপে রাখবে না। পুলিশে খবর দেবে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ছুটে এসে নিমকির শোবার জায়গা অর্থাৎ ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে মশলাপাতির কৌটো, তেলের টিন, চাল ডালের বস্তা নেড়েচেড়ে দেখবে। এবং একসময় ঠিক পুরোনো জুতোর বাক্সটা খুঁজে পাবে।

বাক্স খুললেই দেখতে পাবে দশ নম্বর ঘরের বাবুর তোষকের তলা থেকে চুরি করে আনা একশ টাকার দশটা নোট।

দৃশ্যটা কল্পনা করে নিমকি শিউরে উঠল। কাজেই সে অপেক্ষা করছিল। রাত আরো বাড়ুক। এবাড়ির ওবাড়ির, রাস্তার গলির সব মানুষ ঘুমিয়ে পড়ুক। রাস্তার মানুষও কোথাও না কোথাও গিয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরে তার মাদুরের বিছানার ওপর নিমকি চুপ করে বসে রইল।

বাবুদের খাবার ঘরে দুটো টেবিল জোড়া লাগিয়ে ভোলা বিছানা করে শুয়েছে।

বেশ কিছুটা সময় কাটল। নিমকি সন্দেহ করছিল ভোলা জেগে থাকবে না, জেগে থাকার কথাও নয়। কারণ খেতে বসে নিমকি তাকে এমন কোনো আভাস দেয়নি যে, মধ্য রাত্রে নিমকি খাবার ঘরে ঢুকে ভোলার বিছানার কাছে গিয়ে একটা ভয়ংকর জরুরী কথা তাকে শোনাবে।

কাজেই ভোলার নাক ডাকবে। ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর তার নাক ডাকে, উপায় কি। তখন আস্তে ওঘরে ঢুকে নিমকি ভোলাকে জাগাবে।

হুঁ, গায়ে হাত দিতে হবে বৈকি। তা না হলে ভোলার ঘুম ভাঙবে না। ভীষণ ভারি ঘুম তার। চেঁচামেচি করে তাকে জাগানোর প্রশ্নই ওঠে না।

মাঝরাতে চেঁচামেচি বড় ভয়ংকর জিনিস। দোতলার সব মানুষ একসঙ্গে জেগে যাবে। তারা নিচে ছুটে আসবে। তারা তখনই একটা কিছু সন্দেহ করবে।

এই পর্যন্ত চিন্তা করে নিমকি চুপ করে রইল। এবং এটাও সত্য, একটু পরে আবার সে ভাবল, এভাবে নিশুতি রাত্রে চুপি চুপি ভোলার বিছানা ঘেঁষে দাঁড়ানো ও তার গায়ে হাত রাখা—এতে কাজটা খুব সহজ হবে, ভোলা চট করে রাজী হয়ে যাবে। হতেই হবে।

কারণ নিমকি সর্বদাই কথাটা শুনত, মা মুড়ি ভাজতে বসলে মাকে ঘিরে বসে সব উনুনের ধারে যখন আলোচনা করত।

পুরুষকে বশ করার, তার মন টলাবার এর চেয়ে বড় কৌশল আর

কিছু নেই সংসারে। মেয়েছেলে যদি তখন উদোম গা হয়ে মরদের বিছানার কাছে যায় তো আরো ভাল হয়।

নিমকির মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। এমন একটা কিছু করতেই হবে তাকে।

তাকে বাঁচাতে হলে, ভোলাকে হাত করতে হলে এ ছাড়া যে উপায়ও নেই।

হোটেল বাড়িটা থমথম করছিল। এক সময় নিমকির মনে হল রাস্তায় আর কোনো শব্দ হচ্ছে না, গাড়ি ঘোড়া চলছে না, একটা মানুষও যেন হাঁটছে না।

আস্তে আস্তে নিমকি উঠে দাঁড়াল। আর ঠিক তখন ওপরে ম্যানেজারের ঘরের বড় দেয়াল ঘড়িটায় ঢং করে একটা শব্দ হল। একবারই শব্দ হল! বোঝা গেল একটা বেজেছে। এই ঠিক সময়। উপযুক্ত সময়।

তার বুকের ভিতর ঢুবঢুব শব্দ হচ্ছিল। তার মনে হল এই শব্দটাও না হলেই ভাল ছিল। কিন্তু এমন একটা উত্তেজনার মুহূর্তে ভয়ের মুহূর্তে হৃৎপিণ্ডের শব্দ চাপা দেওয়া সম্ভব না। কাজেই বুকের ঢুবঢুব শব্দ নিয়েই নিমকি চালের বস্তার পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে কাগজের বাক্সটা তুলে আনল। আলো জ্বালল না, অন্ধকারেই কাজটা করতে পারল। কেননা এতগুলি টাকা শুদ্ধ বাক্সটা কোথায় কী অবস্থায় রয়েছে, এই ক ঘণ্টায় তার মুখস্ত হয়ে গেছে।

নোটের বাণ্ডিলটা সে কোমরে গুঁজল। হাতের আন্দাজে খালি বাক্সটা, আগে যেমন ছিল, সেই তাকের ওপর আবার তুলে রাখল, তারপর পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এখন আর হৃৎপিণ্ডের শব্দ হচ্ছিল না। যেন খুব করে দম চেপে রাখার ফলে শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। নিমকি মনে মনে খুশি হল।

ভোলার ঘরের দরজা হা-খোলা হয়ে আছে। চিরকাল সে দরজা খুলে রেখে শোয়।

আজ যেন বেশী নাক ডাকছে তার। কুম্ভকর্ণের ঘুম, নিমকি মনে মনে বলল।

'ভোলা! এই ভোলা!' ফিসফিস গলায় নিমকি ডাকল। তার গায়ে হাত রাখল। ঘামে ভিজে গেছে ভোলার পিঠ। উপুড় হয়ে শুয়েছে। পিঠটা ঠাণ্ডা। নিমকির হাতে ঘাম লাগল। ঘামের বোটকা গন্ধ নাকে লাগল। জোয়ান ছেলের গন্ধ বড় বেশি। —'ভোলা এই ভোলা!'

'কে! কে!' অন্ধকারে ভোলা চোখ খুলল। হঠাৎ সে কিছু বুঝতে পারছিল না। কে তাকে ডাকছে, কে তার গায়ে হাত রাখছে। এখন আবার হাতটা সরিয়ে নিয়েছে। 'কে তুই!' ঘুমের জড়তা কাটছিল না বলে ভোলার কথাটাও জড়ানো ছিল।

'আমি রে, আমি।' ভোলার মুখের কাছে মুখটা সরিয়ে আনলো নিমকি।

'নিমকি!'

'হুঁ।'

'কি বলছিস?'

'তোর ঘুম ভেঙেছে?'

ভোলা উঠে বসল। বড় করে একটা হাই তুলল। ঘাড়টা এদিক ওদিক নেড়ে কাঁধের পিঠের আড় ভাঙল।

'এত রাত্রে এখানে তোর কি দরকার।' ভাল করে জেগে উঠে খুব বিরক্ত হল সে।

'দরকার বলেই তো এসেছি, শোন।' ভোলার ঘামে ভেজা উরুর

ওপর হাত রাখল নিমকি। 'তখন বলেছিলাম, একটা জরুরী কথা আছে, মনে আছে?'

ভোলা মনে করতে পারছিল না। অন্ধকারে সব তার গুলিয়ে যাচ্ছিল। এমন মাঝ রাতে কোনোদিন মেয়েটা আসে না এঘরে।

'জরুরী কথা, কিসের জরুরী কথা!' ধমক দিয়ে উঠল ভোলা। গলার স্বর গুনগুন করে উঠল।

'আস্তে, আস্তে!' নিমকি ফিসফিসিয়ে উঠল। যেন অন্ধকারে সে দেখতে পাচ্ছিল। ভোলার রোঁয়া ওঠা খসখসে থুতনির ওপর নিমকি তার নরম হাতটা রাখল। ভোলা একটা ঢোক গিলল। খুব একটা রাগ করতে পারল না।

'কি বলছিস?'

'বলছিলাম কি, রাতদিন এমন গালাগাল দাঁত খিঁচুনি খেয়ে এখানে পড়ে থেকে লাভ নেই—চল দুজনে কোথাও পালিয়ে যাই।'

'কোথায় পালিয়ে যাব?'

'সেটা পরে ঠিক করা যাবে, তুই এখানকার চাকরি ছেড়ে যেতে রাজী কিনা বল। আমি তুই একসঙ্গে হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।'

'চাকরি ছেড়ে দিলে খাব কী?'

'আচ্ছা, সেটা আমি দেখব, সেজন্য তোকে ভাবতে হবে না। তুই রাজী কিনা বল।'

'তোর কথা আমি বুঝতে পারছি না। তোর সঙ্গে গিয়ে আমার লাভটা কি?'

'লাভ!' শব্দ হয় কি না হয়—চাপা গলায় নিমকি একটু হাসল। 'দুটি ছেলেমেয়ে একসঙ্গে কেন পালিয়ে যায় তুই কি জানিস না?'

ভোলা হঠাৎ গুম হয়ে রইল।

'কি হল, কথা বল।'

'আমি তোর কথা বুঝতে পারছি না।' ভোলা আবার বিরক্ত হয়ে উঠল।

'শোন, অনেকদিন ভেবেছি তোকে বলব, কিন্তু বলতে পারছিলাম না, আজ যেন মনটা কিছুতেই মানছিল না, আমি তোকে ভালবাসি।' এবার ভোলার হাত বা থুতনি ধরল না নিমকি, তার দুকাঁধ জড়িয়ে ধরল। তার শরীরের সঙ্গে শরীর ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

ভোলা চমকে উঠল, আঁৎকে উঠল।

'এ কি, তোর গায়ে জামা নেই, খালি গা!'

'হুঁ, তা না হলে তুই বুঝবি কি করে যে আমি তোকে ভালবাসি।'

'ছি ছি, তুই এত অসভ্য! উদোম গা হয়ে একটা বেটাছেলের কাছে চলে এসেছিস!'

নিমকি হঠাৎ থতিয়ে গেল। জোরে ধাক্কা মেরে ভোলা তাকে সরিয়ে দিয়েছে।

'এখনো দাঁড়িয়ে আছিস নাকি?' অন্ধকারে ভোলার চাপা গলার গর্জন শোনা গেল।

'হুঁ'। একটা চেয়ারের কোনা ধরে নিমকি দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি তোর ভালর জন্য এসেছিলাম, তোর ভালটাই আমি চাইছি—এখানে লাথি ঝাঁটা খেয়ে কতকাল বাসন মাজবি?'

'আমি তোর সঙ্গে কোথাও যাব না—তুই বাজে মেয়ে!'

'শোন্, আমার কাছে টাকা আছে।' গলার স্বরটা আগের চেয়েও বেশি নরম করে ফেলল নিমকি।

'থাকুক টাকা।' এক সেকেণ্ড চুপ থেকে ভোলা বলল 'কোথায় পেলি টাকা? বাবুদের কেউ দিয়েছে বুঝি?'

নিমকি চুপ।

'কি হল, এখনো দাঁড়িয়ে আছিস!'

ভোলা তার টেবিলের বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল।

'শোন্' নিমকি আবার বুঝাল, 'তোকে চাকরি করতে হবে না। আমি নিজে খাটব, খেটে তোকে খাওয়াব, দূরে কোথাও গিয়ে দুজনে ঘর বাঁধব।'

ভোলা চুপ করে রইল।

সাহস পেয়ে নিমকি আবার কাছে সরে গেল। টের পেয়ে ভোলা ধমক লাগাল।

'আবার এসেছিস, আবার আমার গা ধরছিস!'

'এই গ্যাখ্, ধরে গ্যাখ্, আমার এখানটায়, কত টাকা আমি তোর জন্যে জোগাড় করেছি।' ভোলার হাত টেনে নিয়ে নিমকি কোমরের কাছে রাখতে চাইছিল।

'খানকি, বেশ্যা কোথাকার।' ভোলা আর একটা ধাক্কা দিল। অন্ধকারে নিমকি একটা চেয়ারের ওপর ছিটকে পড়ল। খট্ করে শব্দ হল চেয়ারটায়। তারপরে আবার সব চুপচাপ।

'এসব আজেবাজে কথা বলে আমার মন ভেজাতে চাইছিস, ভেবেছিস এসব বললেই আমি তোর গায়ে হাত দেব। উঁহু, আমি সেই চরিত্তিরের পুরুষ না, উদোম গা হয়ে রাত দুপুরে ঘরে ঢুকছিস আর অমনি তোকে বিছানায় টেনে তুলব? ওয়াক্ থুঃ।' যেন বাবুদের খাবার ঘরেই ভোলা একদলা থুথু ফেলল। 'যা না, ওপরের কোনো বাবুর কাছে যা— না, ঝি চাকরানী বলে বাবুরা তোকে হাত দিয়ে ছুঁতে চাইছে না।'

'ইস তুই আমায় একটু বিশ্বাস করছিস না।' কাঁদ কাঁদ শোনাল নিমকির গলা। 'সত্যি, আমি তোকে ভালবাসি ভোলা।'

'দরকার নেই আমার ভালবাসার। বেবুশ্যে মেয়েছেলের আবার ভালবাসা!'

'ইস্ তুই আমায় এমন গালাগাল করছিস!'

'তুই এ ঘর থেকে বেরিয়ে যা!'

'ভোলা !'

'আবার তুই দাঁড়িয়ে আছিস ! ম্যানেজারকে ডাকব ?'

'শোন্ ।' যেন নিমকি ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। 'দূরে কোথাও সরে গিয়ে দুজনে সুখে ঘর সংসার পাতব—তোর জন্যে এত কষ্ট করি—'

'দাঁড়া, তোকে ঘর সংসার পাতাচ্ছি।' পায়ের দুপদাপ শব্দ করে ভোলা বুঝি ম্যানেজারকে ডাকতে দরজার দিকে গেল। নিমকি ভয় পেল।

'আচ্ছা, আচ্ছা তবে শোন্, তুই এককাজ কর -' যেন ভোলার হাতে টাকার বাণ্ডিলটা গছিয়ে দিয়ে নিমকি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। ভোলা রুখে উঠল।

'আমি তোর কোন কথা শুনতে চাই না, বদ মেয়েছেলে, ল্যাংটো হয়ে আমার সাথে অন্ধকারে পীরিত করতে এসেছেন। আমি এখনি ম্যানেজারকে ডাকছি, বাবুদের ডাকছি—এমন শিক্ষা দেবে তোকে—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে—আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।' ত্রাস নিয়ে হৃৎপিণ্ডের ধপাস ধপাস শব্দ নিয়ে নিমকি ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেও সে কাঁপছিল। পা দুটো বেশি কাঁপছিল। ধপ করে মেঝের ওপর বসে পড়ল। দাঁতে দাঁত চেপে থাকল কিছুক্ষণ। ঢং ঢং করে দোতলায় ম্যানেজারের ঘড়িতে দুটো বাজল।

একটু পরেই তার শরীরের কাঁপুনি থেমে গেল। এবার নিমকির মাথাটা গরম হয়ে উঠল। কেননা সে বেশ বুঝতে পারছিল, আচ্ছা বিপদে পড়ে গেছে সে। তার আর কোনো সন্দেহ রইল না, সকাল হলেই নোটের তাড়া শুদ্ধ সে ঠিক ধরা পড়ে যাবে। ঘুম থেকে উঠে দশ নম্বর ঘরের বাবু যখন টাকার খোঁজ করবেন, টাকা টাকা করবেন, তখন এই ভোলাই বলে দেবে নিমকির কাছে টাকা আছে, রাত্রে টাকা নিয়ে সে তার ঘরে ঢুকেছিল।

মাথাটা গরম হয়ে উঠে নিমকির দুকান দিয়ে আগুনের হল্কার

মতন গরম বাতাস বেরোচ্ছিল। এখন উপায়! ট্যাঁক থেকে খুলে নোটের গোছাটা হাতে নিয়ে সে ভাবতে লাগল। কোথায় রাখে সে এটা এখন? তার হাত যেন জ্বলে যাচ্ছিল। তাই তো, নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে সে, এমন কাজ করতে গেল কেন ও, যা সে কোনোদিনই সামলে নিতে পারে না! কৈ, পারল না তো এত করে বলেও এখান থেকে তাকে নিয়ে সরে পড়তে ভোলাকে রাজী করাতে। না, বোকা লোককে দিয়ে, গোঁয়ারকে দিয়ে কোনদিন এসব কথায় রাজী করানো যায় না। আগেই বোঝা উচিত ছিল নিমকির।

অন্ধকারে নিমকির চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। না, এ ঘরে কাগজের বাক্সের ভেতর এই জিনিস আর লুকিয়ে রাখা চলে না। তবে কি পায়খানার ফোঁকরের ভিতর টাকাটা গুঁজে রেখে আসবে সে।

কিন্তু তখনি তার মনে হল, তা হয় না, ভোরবেলা সকলের আগে ঠাকুর পায়খানায় যায়। গিয়ে দেখবে নর্দমার মুখে এক তাড়া নোট গোঁজা। তখন হৈ-চৈ পড়ে যাবে। দশ নম্বর ঘরের বাবুর যদিও বা তখন পর্যন্ত টাকাটার কথা না মনে পড়ে গিয়ে থাকে, পায়খানার মধ্যে টাকা পাওয়া গেছে শুনলেই তোষক উল্টে দেখবে নোটের তাড়াটা আছে কিনা···তারপর আর কি, নিচে ছুটে এসে পায়খানার ভিতর উঁকি দিয়ে যখন দেখবে এটা তাঁরই টাকার বাণ্ডিল তখন আগে নিমকিকে ধরবে, কেননা দুপুরে নিমকিই দরজার তালা খুলে ঐ ঘরে ঢুকেছিল, সুতরাং সে ছাড়া টাকাটা ঘর থেকে আর কে সরাবে।

না, ওরকম জায়গায় টাকা রাখা যায় না, রান্নাঘরেও না। চৌবাচ্চার ভিতর কি ময়লা ফেলার ড্রাম, সব জায়গার কথা নিমকি ভাবল! কিন্তু কোনোটাই মনঃপূত হল না।

তার চেয়ে, তার চেয়ে বরং—ভাবতে ভাবতে নিমকির চোখের তারা দুটো ভয়ানক চকচকে হয়ে উঠল। যদি কেউ সামনে থাকতো

দেখত অন্ধকারে কেমন সাপের চোখের মত জ্বলছে তার চোখ দুটো, কেননা এতক্ষণ পর একটা কথা মনে পড়ে গেছে নিমকির। হুঁ, বেলেঘাটার মুড়িওয়ালীর মেয়ে সে হোটেলের বাসন মাজে বলে পতিত হয়ে যায়নি, তার মনেও ঘেন্না আছে। বুকের ভিতর আক্রোশের জ্বালা নিয়ে দরকার হলে সেও ছোবল মারতে জানে।

কাজেই নিমকি কান পেতে থাকল।

গোঁয়ারটা আবার নাক ডাকতে আরম্ভ করেছে না?

বিছানায় কাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তো কুম্ভকর্ণ হয়ে যায়।

নিমকি উঠে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে বাবুদের খাবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

হুঁ, নাকের শব্দ শুনে নিমকি বুঝল, এই মাত্র জেগে উঠে আবার শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মরদটা বেহুঁস। কাজেই আর ভয়ের কিছু নেই। চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে নিমকি ঢুকে পড়ল।

উহুঁ, এখন আর গায়ে হাত দেবে না। অন্ধকারে হাতড়ে নিমকি ভোলার শিয়রের বালিশটা ধরল। তার বালিশের যে কী চেহারা নিমকি কদিনই দেখেছে, তেলচিটে খোলাটা ফেটে গিয়ে রোজই কিছু কিছু তুলা বেরিয়ে আসছে। কাজেই নিমকির সুবিধা হয়ে গেল। ফাটা খোলের ভিতর যখন হাতের মুঠোটাও গলে যায়, তখন আর নোটের তাড়াটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে অসুবিধাটা কী।

খুব সাবধানে নিমকি কাজটা সারল। বালিশের ওপর মাথা রেখে মানুষটা শুয়ে আছে। এই অবস্থায় বালিশের খোলের ভিতর নোটের বাণ্ডিল গুঁজে রাখা চারটিখানি কথা না। পাকা হাত না হলে মুস্কিল।

কাজটা সেরে হালকা পায়ে নিমকি বাবুদের খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অন্ধকারে আবার যদি কেউ তখন তাকে দেখত, তেমনি সাপের

চোখের মত চোখ দুটো জ্বলছে, সাপের মতন বিষের নিঃশ্বাস ফেলছে, আর ঠোঁট চিরে আলপিনের মতন সরু বিষাক্ত একটা হাসি উঁকি দিয়েছে।

নিমকি তার শোবার জায়গায় অর্থাৎ ভাঁড়ার ঘরে ফিরে এল। ঢং ঢং করে দোতলায় ম্যানেজারের দেয়াল ঘড়িতে তিনটা বাজল। আর কোনো চিন্তা নাই তার। মেঝের ওপর বিছানাটা টেনে শুয়ে পড়ল।

॥ তের ॥

পরদিন বেশ একটু বেলা করে নিমকির ঘুম ভাঙ্গল, প্রায় রোদ উঠে গেছে, যেন আরো ঘুমোত সে, শেষ রাত্রে শুয়েছে—জেগে গেল ম্যানেজারের হাঁক-ডাকে, বাবুদের হাঁকডাকে, তাঁদের পায়ের শব্দে।

চোখ খুলে ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে এতগুলি মুখ দেখে নিমকির প্রাণ কেঁপে উঠল। সাদা হয়ে গেল মুখটা।

সকলের আগে ম্যানেজার গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। 'কী হল, দুপুর হয়ে গেছে, এখনো তোর ঘুম ভাঙ্গছে না।'

নিমকি চোখ কচলাল, গায়ের কাপড়টা টেনেটুনে ঠিক করল।

নিমকি দেখল ম্যানেজারের পিছনেই দশ নম্বর ঘরের বাবুর মাথাটা।

'এই, শোন্, তুই কাল সন্তোষবাবুর ঘরের চাবি রাখলি, বিছানা-টিছানা রোদে দিলি, তোষকের নিচে টাকা ছিল, দেখেছিলি ?'

'না।' ম্যানেজারের চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না নিমকি। ঘাড় গুঁজে মাথা নাড়ল।

'সে কি কথা।' পিছন থেকে সন্তোষবাবু গলা বাড়িয়ে দিল। একশ টাকার দশটা নোট ছিল, বাণ্ডিল করা ছিল—তোষক বালিশ রোদে দিলি, এতগুলো টাকা তোর চোখে পড়ল না ?'

এবার নিমকি চোখ তুলল। চোয়াল দুটো শক্ত করে ফেলল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমি তোষক রোদে দিই নি। ভীষণ মাথা ধরেছিল। আপনার তোষক আমি ধরিও নি। কেবল আলগোছে বালিশ দুটো তুলে এনে রেলিং-এর ওপর রেখেছিলাম।'

সন্তোষবাবু এগিয়ে এসে চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়াল। ম্যানেজারের

মুখটা একবার দেখে তারপর নিমকিকে দেখল। যেন ভদ্রলোক বুঝতে পারছিল না এ কথার পর মেয়েটাকে আর কি বলা যেতে পারে। কিন্তু ম্যানেজার চুপ করে থাকল না।

'না-ই বা তোষক রোদে দিলি। সারাদিন বাবুর ঘরের চাবি তোর কাছে ছিল, আর তো কেউ যায়নি।'

'কেন, তোষক রোদে দিসনি কেন? আমি তো তোষক রোদে দিতেও বলে গেলাম।' এবার সন্তোষবাবু কটমট করে নিমকির মুখটা দেখল।

'আমার মাথা ধরেছিল। আমার শরীর ভাল ছিল না।' কাঠ কাঠ গলায় নিমকি উত্তর করল।

'যাই হোক', ম্যানেজার গলা চড়িয়ে দিল, 'তোষক রোদে দিলি কি দিলি না, তাতে কিছু এসে যায় না। ঘরের চাবি সারাদিন তোর কাছে ছিল—তুই ছাড়া ওঘরে আর কেউ ঢোকেনি—বাবুর বিছানার নিচে হাজার টাকার একটা নোটের বাণ্ডিল ছিল। টাকাটা এখন আর সেখানে নেই। পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পুলিশে খবর দিন, পুলিশে খবর দিন।' পিছন থেকে অন্য বাবুরা সোরগোল তুলল। 'এমনি কি আর টাকার কথা স্বীকার করবে?'

চোখ পাকিয়ে নিমকি সব ক'টা মুখ দেখল, তারপর উঠে দাঁড়াল।

'আপনারা এসব কথা বলতে পারেন।' কথাটা বলেই নিমকি কেমন করে জানি একটু হাসল। 'কিন্তু আপনারা কি সারাদিন হোটেলে ছিলেন?' বেশ কড়া গলায় সে উত্তর করল।

'না, তা থাকব কেন—আমাদের অফিস কাছারী আছে। হোটেলে বসে থাকলে আমাদের চলবে কেন।' বাবুরা এক সঙ্গে উত্তর করল।

'তবে আপনারা চুপ করে থাকুন।' নিমকি সন্তোষবাবুর দিকে তাকাল। 'আপনি একবার ঠাকুর মশাইকে ডাকুন।'

'এই যে আমি এখানেই।' ঠাকুর সকলের পেছনেই ছিল।

'এখানে এসো ঠাকুর, সামনে এসো।' গম্ভীর গলায় ম্যানেজার ডাকল।

ঠাকুর সামনে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে নিমকি ঘাড় উঁচিয়ে বাবুদের পিছনটা দেখতে চেষ্টা করল।

'ভোলা কই, ভোলাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। ঠাকুর মশাই।'

'ভোলা আছে। ভোলা কয়লা ভাঙ্গছে।' ঠাকুর নরম চোখে নিমকির মুখটা দেখছিল।

'আচ্ছা, ঠাকুর মশাই', নিমকি বলল, 'কাল কয়লা ভাঙ্গতে গিয়ে আমার যখন আঙুল থেঁতলে গেল, শরীরটা বেশি খারাপ করল, তখন আপনি ভোলাকে ওপরে যেয়ে দশ নম্বর ঘরের বালিশ দুটো রেখে আসতে বলেছিলেন কিনা—আমার আঁচল থেকে ভোলা তখন চাবি খুলে নিয়ে ওপরে গেল কিনা?'

'হুঁ' ঠাকুর বড় করে ঘাড় নাড়ল। 'ভোলা চাবি নিয়ে ওপরে গিয়েছিল।' ঠাকুর একসঙ্গে সন্তোষবাবু এবং ম্যানেজারের দিকে তাকাল।

'ভোলা, ভোলা!' ম্যানেজার চেঁচিয়ে ডাকল।

বাবুদের ভিড় ঠেলে ভোলা এসে দাঁড়াল।

'তুই কাল নিমকির কাছ থেকে চাবি নিয়ে উপরে গিয়েছিলি?'

কথা বলছিল না ভোলা। মুখটা বেজায় গম্ভীর। হাতে কয়লার কালি। ভোলা চোখ ঘুরিয়ে ম্যানেজার, সন্তোষবাবু, ঠাকুর ও পরে নিমকির মুখটা দেখল। নিমকিকে একবারের জায়গায় দুবার দেখল।

'কি হল, কথা বলছিস না কেন?' সন্তোষবাবুর চোখ লাল হয়ে উঠল।

'রেলিং থেকে বালিশ তুলে রাখতে আমার ঘরে ঢুকেছিলি?'

'হুঁ।'

'তোষকের নিচে টাকা ছিল তুই দেখেছিলি?'

'আমি তোষক ধরিনি। বিছানার ওপর বালিশ ছুটো ছুঁড়ে দিয়ে তখনই আবার দরজায় তালা দিয়ে নিচে চলে এলাম।'

'পুলিশ ডাকুন, এখুনি পুলিশে খবর দিন।' বাবুর দল আবার সোরগোল তুলল। 'এরা এভাবে কিছু স্বীকার করবে না। এদের কাছ থেকে কথা আদায় করা মুস্কিল।'

'এই ভোলা!' যেন ম্যানেজারের ধারণা চোখ লাল করে তর্জন গর্জন করলে ভোলা সত্য কথা বলবে। 'আমার চোখের দিকে তাকা!'

ভোলা তাকাল। কিন্তু তার তাকানোর মধ্যে তেমন একটা নরম ভাব ছিল না। বরং ঘাড়টা কেমন যেন শক্তকরে রেখে একটা উদ্ধত ভঙ্গি নিয়ে ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকাল।

'তুই টাকার কথা কিছুই জানিস না?' ম্যানেজারের চোয়াল ছুটো কঠিন হয়ে উঠল।

'না।' ভোলা সংক্ষেপে উত্তর করল।

'নিমকির কাছে কাগজের নোট টোট কিছু দেখেছিলি?'

'না।'

রেগে গিয়ে ম্যানেজার কাঁপছিল।

'জানিসতো এখন তোকে জুতো পেটা করা হবে। তারপর নিশ্চয় মুখ থেকে কথা বেরোবে?'

'করুন জুতো পেটা।' একটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে ভোলা ম্যানেজার এবং অন্য সব বাবুদের মুখ দেখল।

'এই ছুঁড়ি, ভোলার কাছে টাকা ফাকা কিছু দেখেছিস?' দাঁত খিঁচিয়ে ম্যানেজার নিমকির দিকে চোখ রাখল।

আশ্চর্য, ম্যানেজারের এই প্রশ্নের পর ভোলা কেমন যেন একটা কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে নিমকিকে দেখছিল। নিমকির মুখটা আরও শুকিয়ে গেছে, কাগজের মতন সাদা হয়ে গেছে।

'আমি ভোলার কাছে টাকা দেখিনি।' নিমকি আস্তে বলল।

'না, না, এমনিতে হবে না ম্যানেজারবাবু। আপনি থানায় একটা ফোন করে দিন।' সন্তোষবাবু চৌকাঠের কাছ থেকে সরে এল। 'আমরা টাকাটা বের করতে পারব না। এ আমাদের কাজ নয়—পুলিশ আসুক—যা করার পুলিশ করবে।' রাগে কাঁপতে কাঁপতে ম্যানেজারও তখন ভাঁড়ার ঘরের দরজা থেকে সরে এল।

ম্যানেজারের সঙ্গে সন্তোষবাবু এবং অন্য বাবুরা জুতোর শব্দ করে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে গেল। যেন সকলে ম্যানেজারের অফিস ঘরে ঢুকল। সেখানে টেলিফোন রয়েছে।

'সকালবেলা কী সব কাণ্ড!' ঠাকুর বিড়বিড় করছিল। রান্নাবান্না কাজকর্ম সব পড়ে আছে।'

ভোলা কথা বলছিল না। নিজের কালিমাখা হাত দুটো একবার দেখে নিয়ে যেন আবার কয়লা ভাঙ্গতেই চৌবাচ্চার ওদিকটায় চলে গেল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে নিমকি ওদিকে পাঁচিলের ওপর কাক দুটোকে দেখছিল।

একটু পরে জন চারেক কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে একজন পুলিশ অফিসার হোটেলে চলে এল।

দুজন কনেষ্টবলকে গেট্ এর কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে বাকি দুজনকে সঙ্গে নিয়ে অফিসার সোজা দোতলায় ম্যানেজারের ঘরে চলে গেল।

সন্তোষবাবু এবং ম্যানেজার ছাড়া অন্য বাবুদের সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হল। সন্তোষবাবু ও ম্যানেজারের সঙ্গে পুলিশ অফিসারের বেশ কিছুটা সময় কী সব কথাবার্তা হল।

তারপর ঠাকুরকে ডাকা হল। সবে উনুন ধরিয়ে ঠাকুর তখন ভাতের হাঁড়ি চাপাতে যাচ্ছিল। ম্যানেজারের ডাক শুনে ঠাকুর ওপরে ছুটে গেল। ঠাকুরকে দুটো একটা কথা জিজ্ঞাসা করার পর

ম্যানেজার ও সন্তোষবাবুর সঙ্গে অফিসারটি নিচে নেমে এল। প্রথমে নিমকিকে ডাকা হল।

নিমকিকে পর পর অনেকগুলি প্রশ্ন করা হল। নিমকি কোনোটার 'হ্যাঁ' কোনোটার 'না' উত্তর করল। তারপর ভোলাকে ডাকা হল। আবার প্রশ্নের পর প্রশ্ন। ভোলা তার ইচ্ছা মত 'হ্যাঁ' 'না' বলে গেল।

টাকার কথা দুজনের কেউ স্বীকার করল না। নিমকির মতন ভোলাও বলল, সন্তোষবাবুর তোষকের নিচে নোটের বাণ্ডিল ছিল কিনা সে বলতে পারে না। ভোলা আরও বলল, বাবুর বিছানার কাছেই সে যায় নি। দূর থেকে বালিশ দুটো খাটের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সে দরজা বন্ধ করে নিচে চলে এসেছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের কাজ শেষ করে পুলিশ অফিসার ম্যানেজারের কানে কানে কী বলতে ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল।

ম্যানেজারের পিছু পিছু অফিসার ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল। চালের বস্তা ডালের টিন মশলাপাতির কৌটো—সব খোঁজা হল। দড়িতে ঝোলানো নিমকির শাড়ি জামা নেড়েচেড়ে দেখা হল। তার টিনের স্যুটকেশটা খোলা হল। মাদুরে জড়ানো বিছানাটাও খুলে ভাল করে ঝেড়ে দেখে পরীক্ষা করা হল, নোটের তাড়া খুঁজে পাওয়া গেল না।

ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ অফিসার ও কনেষ্টবল দুজন ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এবার ভোলার জিনিসপত্র তল্লাসী হবে বোঝা গেল। যেন সকলেই বুঝতে পারছিল, নিমকির কাছে টাকা পাওয়া গেল না, কাজেই ভোলার জিনিষপত্র বা বিছানাপাটি খোঁজা হলে নোটের বাণ্ডিলটা নির্ঘাৎ বেরিয়ে পড়বে। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি সে টাকাটা বাইরে পাচার করে না থাকে।

আবহাওয়াটা কেমন থমথম করছিল। যেন একটা দম বন্ধ হওয়া কৌতূহল নিয়ে সকলেই অপেক্ষা করছে।

কিন্তু ভোলার জিনিসপত্র কোথায় থাকে?

রাত্রে সে বাবুদের ডাইনিং হলে টেবিল জোড়া করে শোয়।

দিনের বেলা তার বিছানাপাটি জামাকাপড় কি বাক্সটাক্স যদি কিছু থাকে তো সে সব কোথায় রাখা হয় সেই খবর যেন ম্যানেজারেরও জানা ছিল না। ডাইনিং হলে এখন কটা টেবিল চেয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই।

'তোর পোঁটলাপুঁটলি বিছানাপাটি কোথায়?'

ম্যানেজার প্রশ্ন করতে ভোলা আঙুল দিয়ে দোতলার সিঁড়ির নিচের অন্ধকার জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

'টেনে বার কর সব।' ম্যানেজার ধমক লাগাল। কিন্তু পুলিশ অফিসার ভোলাকে ওখানে যেতে বারণ করল। তাঁর চোখের ইসারা পেয়ে একজন কনেস্টবল সিঁড়ির তলার অন্ধকার খুপরি থেকে ছেঁড়া মাদুরে জড়ানো একটা বিছানা ও একটা কাপড়ের থলে টেনে বের করল।

'এই? আর কিছু নেই তোর?'

অফিসারের চোখের দিকে চেয়ে ভোলা মাথা নাড়ল।

'গরিব মানুষ। আর কী থাকবে বলুন।'

'থাক এত সব কথা বলতে হবে না।'

ধমক খেয়ে ভোলা চুপ করে গেল।

কনেস্টবল থলের ভিতর থেকে একটা ময়লা সার্ট, একটা পায়জামা, একটা গামছা, ছোট একটা আরসি ও চিরুনি বের করল। এক টুকরো কাপড়কাচা সাবান পেল। আর কিছু নেই।

থলেটা দুবার তিনবার করে ঝেড়ে পরীক্ষা করা হল। সার্টের পকেট পায়জামা ও গামছার ভাঁজ খুলে দেখা হল। দুটো নয়া

পয়সা ও পুরোনো খামের টিকিট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

কনেস্টবল এবার বিছানা পরীক্ষা করতে লেগে গেল।

মাতুরটা সরিয়ে ফেলতে একটা ময়লা ছেঁড়া কাঁথা ও বালিশ বেরোল। বালিশ বলা যায় না, সামান্য কিছু তুলো দিয়ে থলের মতন একটা জিনিস। কিন্তু জিনিসটা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই কনেস্টবলের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল।

কনেস্টবলের চেহারা দেখে পুলিশ অফিসার একটা কিছু আঁচ করল। তৎক্ষণাৎ ছোঁ মেরে তার হাত থেকে বালিশটা তুলে নিয়ে ছেঁড়া জায়গাটার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল। যখন হাতটা টেনে বার করল দেখা গেল তাঁর হাতে জট পাকানো একগাদা ময়লা তুলা ও একটা নোটের তাড়া।

'মিঃ মুখার্জি!' পুলিশ অফিসার সন্তোষবাবুর দিকে ঘুরে দাঁড়াতে সন্তোষবাবু সামনের দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে নোটের তাড়াটা দেখল।

'গুণে দেখুন।' অফিসার সন্তোষবাবুর হাতে নোটের গোছাটা দিল।

সন্তোষবাবু রবার স্ট্র্যাপটা সরিয়ে ফেলে এক দুই করে নোটগুলি গুণল। একশ টাকার দশটা নোট।

'ও কে?' পুলিশ অফিসার মাথা ঝাঁকাল।

'ঠিক আছে।' সন্তোষবাবু ঘাড় নাড়ল। 'পরশু অফিস থেকে ফিরে এভাবে বাণ্ডিল করা অবস্থায় আমি টাকাটা তোষকের নিচে রেখে দিয়েছিলাম। এই টাকাই আমার।'

পুলিশ অফিসার তৎক্ষণাৎ ভোলার দিকে মুখ ফেরাল।

'তোর বালিশের মধ্যে টাকাটা এল কী করে?'

ভোলা যেন একটুও বিস্মিত হল না, ভয় পেল না, যেন তখনই একটা কিছু সে আঁচ করে ফেলেছে।

রান্নাঘরের দরজার কাছে ঠাকুরের পাশে নিমকি দাঁড়িয়ে। নিমকির চোখের পলক পড়ছে না। যেন তার শ্বাসও পড়ছিল না। কাঠের মত স্থির হয়ে এদিকে চেয়ে আছে।

ভোলা একবারও কিন্তু তার দিকে চোখ ফেরাল না। কোনোদিকেই সে তাকাচ্ছিল না।

'কি হল চুপ করে আছিস কেন!' অফিসার জোরে ধমক লাগাল। 'কোথা থেকে এই টাকা এল?'

'আমি বলতে পারব না।'

কথাটা সে ভাল করে শেষ করতে পারেনি, রূঢ় কঠিন হাতে ক্রুদ্ধ অফিসার দেওয়ালের সঙ্গে ভোলার মাথাটা ঠুকে দিল। ডুম করে একটা আওয়াজ হল। পিছনে দাঁড়িয়ে বাবুরা তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে ইস্ ইস্ করে উঠল। যেন ভোলার মাথাটা ফেটেই গেল।

কিন্তু ভোলা স্থির নির্বিকার। মুখটা একটু বিকৃত করল না পর্যন্ত।

'তোকে ছেড়ে দেওয়া হবে।' যেন ম্যানেজারের মনে একটু দয়ার উদ্রেক হল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'টাকাটা সন্তোষবাবুর ঘর থেকে এনেছিলি স্বীকার কর না গাধা।'

কিন্তু ভোলা কিছুই বলছিল না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে।

'তা হলে কি তুই বলতে চাস টাকাটা উড়ে এসে তোর বালিশের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল?' ম্যানেজার আবার গরম হয়ে উঠল।

'থাক।' পুলিশ অফিসার ম্যানেজারকে হাতের ইসারায় চুপ করতে বলল। তারপর কনেস্টবলের দিকে চোখ ঘুরিয়ে কি একটা ইঙ্গিত করতে কনেস্টবল এগিয়ে এসে ভোলাকে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

'যাও, এবার লালবাজার গিয়ে পেদানি খাবে।' পিছন থেকে বাবুদের মধ্যে একজন বিড়বিড় করে উঠল।

'আচ্ছা, ম্যানেজারবাবু?' পুলিশ অফিসার ম্যানেজারের দিকে

ঘুরে দাঁড়াল। 'আপনার চাকরটিকে আমি থানায় নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি।'

'আপনাদের যা নিয়ম তাই করবেন স্যার, আমি আর কী বলব।' ম্যানেজার একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল।

'মিঃ মুখার্জি!'

সন্তোষবাবু হাত বাড়িয়ে দিতে পুলিশ অফিসার তার সঙ্গে করমর্দন করল।

তারপর ভোলাকে নিয়ে পুলিশের দল হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল। একটা কালো ভ্যান নিয়ে তারা এসেছিল।

গেট্-এর সামনে থেকে গাড়িটা যখন চলে যায়, তখনই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটল।

বস্তুত এমন ব্যাপার ঘটবে কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

অপ্রত্যাশিত তো বটেই, কেমন যেন হেয়ালীর মতন ঠেকছিল সব ব্যাপারটা!

ভোলাকে নিয়ে পুলিশ বেরিয়ে যেতে বাবুরা দোতলায় উঠে যাচ্ছিল, ম্যানেজার তাঁর ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। ঠাকুর বুঝি তখনি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

না, নিমকির দিকে তখন আর কারো চোখ ছিল না।

কিন্তু কেউ যদি সেই মুহূর্তে নিমকির চেহারাটা দেখত, ভয় পেত। চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে আছে, যেন জ্যান্ত মানুষের চোখ না। চীনা মাটির কি কাঠের পুতুলের চোখ, দুটো চোখে কোনরকম স্পন্দন ছিল না, প্রাণ ছিল না।

কিছু গেলার সময় মানুষ যেমন ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ধরে, নিমকির ঠোঁটও সেরকম ফাঁক হয়ে ছিল। দেখলে মনে হতে পারত, নাক দিয়ে শ্বাস টানতে কি শ্বাস ফেলতে তার কষ্ট হচ্ছে, তাই ঠোঁট

দুটো মেলে রেখে মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। আর ভয় পাওয়া মানুষের মতন কান খাড়া করে রেখেছে। যেন অনেক দূরের একটা ভয়ের শব্দ সে শুনছিল।

অবশ্য শব্দটা খুব কাছেই হচ্ছিল, প্রায় তার কানের গোড়ায়। বুটের শব্দ করে পুলিশের দল বেরিয়ে যাচ্ছে। দারোয়ান গেট্ খুলে দিচ্ছে। ভোলাকে নিয়ে পুলিশ গাড়িতে উঠছে। স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি শব্দ করে উঠল!

তখন আর নিমকি স্থির থাকতে পারল না, স্বপ্নে পাওয়া মানুষের মতন কেউ বলল ছুঁড়িকে ভূতে ধরেছিল, হোটেলের অন্দরমহল পার হয়ে নিমকি সদরের দিকে ছুটল।

যদি ঠাকুরের চোখে পড়ত, এমন করে নিমকিকে ছুটতে দিত না, ধরে ফেলত। ম্যানেজার কি বাবুরা দেখলেও তাকে বাধা দিত।

এমন কি দারোয়ান পর্যন্ত লক্ষ্য করল না। তখনো গেট খুলে রেখে রাস্তায় কার সঙ্গে জংবাহাদুর গল্প করছে, আর সেই ফাঁকে নিমকি রাস্তায় নেমে গেল। তার চোখ পুলিশের গাড়িটার দিকে।

কালো গাড়িটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। ট্রাফিকের ভিড়। না হলে এতক্ষণে এই রাস্তা পার হয়ে কোন্ রাস্তায় ওটা ঢুকে পড়ত। তাই নিমকির যেন খুব আশা ছিল গাড়িটা ধরতে পারবে। সেই আশা নিয়েই সে ছুটছিল, চুল খুলে গেছে, আঁচলটা হাওয়ায় উড়ছিল, ছুটতে ছুটতে নিমকি চিৎকার করে বলছিল, 'শুনুন দারোগাবাবু, শুনুন, আমার একটা কথা আছে—'

তার যে কী কথা ছিল কেউ শুনল না, কেউ জানল না। পিছন থেকে একটা লরী ছুটে এসে এমনভাবে নিমকিকে ছিটকে ফেলে দিল যে মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল, প্রাণটাও তখনি বেরিয়ে গেল।

...

পরে এই নিয়ে হোটেলে আলোচনা হয়েছে, কেবল আমাদের এই হোটেলে না, এ পাড়ায় আরো দু তিনটা হোটেল আছে—হোটেল, চায়ের দোকান, পান সিগারেটের দোকান, স্টেশনারী দোকান, মিষ্টির দোকান—ভোলাকে প্রায় সবাই চিনত—সকলেই তখন বলাবলি করছিল, ভোলাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ছুঁড়ি পাগল হয়ে গিয়ে এভাবে ভ্যানের পিছনে ছুটছিল।

শেষ